রেসকোর্সের পাশের রাস্তায়

শেখর বসু

সৃষ্টি প্রকাশন

কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৬১
প্রকাশক : অমল সাহা
সৃষ্টি প্রকাশন, ৩৩ কলেজ রো কলকাতা ৭০০ ০০৯।
প্রচ্ছদ : অনুপ রায়
মুদ্রক : মিত্র দীপ প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি.
৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭৩।

'সৃষ্টি'র কথা

উনবিংশ শতাব্দীকে বলা হয় বইয়ের শতক। বিংশ শতাব্দীর গর্ব, তা নাকি ফিল্মের, আর একবিংশ শতাব্দী পূর্বচিহ্নিত হয়ে রয়েছে টেলিভিশনের জন্য। এই বাতাবরণে দাঁড়িয়ে একটা কথা এখন প্রায় স্লোগানে দাঁড়িয়ে গিয়েছে— বই আর কেউ পড়তে চায় না। ওটা সেকেলে অভ্যেস। বই পড়ুন, বই পড়ান— পোস্টার নিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীদের পদযাত্রা সেই ভাবনাকেই আরও উসকে দেয়।

আমরা কিন্তু এই ভাবনার শরিক নই। আমরা বিশ্বাস করি, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার আগুনে পুড়তে পুড়তেও ফিনিক্স পাখির মতো বেঁচে থাকবে, ডানা মেলে আকাশে উড়বে এবং দিগন্তের মৃত্তিকা স্পর্শ করবে বই। বিদেশে গ্রন্থপাঠের সাম্প্রতিক প্রবণতা আমাদের বিশ্বাসকেই বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করে। এই চিন্তা থেকেই জন্ম সৃষ্টি প্রকাশনের— সৃষ্টি পরিবারের প্রথম সন্তান। জন্মলগ্নেই যে শুনেছে প্রকাশকের কান্না, চোখ খুলেই যে অনুভব করেছে লেখকের হাহাকার। জ্ঞান হওয়ার আগেই যার মনে হয়েছে বাংলা প্রকাশন আজ মুমূর্ষু শিল্পের অন্তর্গত।

অথচ এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না। বাংলা ভাষায় সাহিত্যসেবীরা যে বিশ্ববন্দিত সে কথা আজ আর অজানা নয়। সেই সুমহান ঐতিহ্যকে মাথায় রেখেই সৃষ্টি প্রকাশন তাদের কাজ শুরু করেছে। আমাদের ব্রত বাংলা প্রকাশনা জগতের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনা। আমরা বিশ্বাস করি, যে জমি একদা সুফলা ছিল তা কখনও বন্ধ্যা হতে পারে না। দরকার যুগোপযোগী সার দিয়ে তাকে উর্বর করে তোলা, যাতে নবীন-প্রবীণ লেখকেরা শুধু তাঁদের সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধ থেকে লেখার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। বাকি দায়িত্ব তো আমাদের। আমরা মনে করি, বাংলা বইয়ের পাঠক ছিল, আছে, থাকবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি যাতে বাংলা প্রকাশনা জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে।

রেসকোর্সের পাশের রাস্তায়

নন্দন বরাবরই রহস্যের খুব ভক্ত। রহস্য বলতে রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের রহস্য নয়। ওর কথায় 'সত্যিকারের রহস্য'। বলে, বেশিরভাগ রহস্যই মানুষ ভেদ করতে পারেনি। কেন জানিস, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বহু জিনিসের নাগাল পাওয়া যায় না। আর পাওয়া যায় না বলেই আমরা 'আজগুবি', 'অলৌকিক' এমনকি 'গাঁজাখুরি' বলে সেগুলো ধামা চাপা দিতে চাই। প্রতিটি জিনিসকে যুক্তিবুদ্ধির আলোয় দেখার চেষ্টা করা কিন্তু বাতিক ছাড়া আর কিছুই নয়। জিনিসটা আছে — কিন্তু কেন আছে, কী ভাবে আছে জানতে না পারলেই ক্ষেপে যায় মানুষ।

সেদিন ওর সঙ্গে আমার তর্ক করার ঝোঁক চেপে গিয়েছিল হঠাৎ। বলেছিলাম, 'সত্যিকারের শিক্ষা মানেই তো জ্ঞানের আলো। জ্ঞানের আলোর প্রথম কাজই হল অন্ধকার দূর করা।'

নন্দন কাঁধ মৃদু ঝাঁকিয়ে জবাব দিয়েছিল, 'তা করুক না। কে বারণ করেছে করতে। কিন্তু রহস্যের সমাধান করতে না পারলেই বিষয়টাকে আজগুবি বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। আমি কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্ত নই। বিজ্ঞানকে পুরোমাত্রায় মানি। বিজ্ঞানের সাহায্যে নতুন কোনও পথ দেখা গেলে আর সবার মতো আমিও খুশি হই। কিন্তু যে রহস্যের কিনারা বিজ্ঞান করতে পারেনি, সেটাকে আশ্চর্য এক রহস্য বলে মেনে নিলেই তো ঝামেলা মিটে যায়। তা না, বিজ্ঞানের নাম করে এক শ্রেণীর লোক বিষয়টাকে আজগুবি বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এটা ঠিক নয়।'

আমার তর্ক করার ঝোঁক একটু বেড়ে গিয়েছিল। বলেছিলাম, 'বিজ্ঞান মানেই তো প্রমাণ। প্রমাণ দিতে না পারলে সেই জিনিসটার অস্তিত্বই স্বীকার করে না বিজ্ঞান।'

নন্দন আমাকে একটু ধমকে উঠে বলেছিল, 'সব কিছুরই প্রমাণ দেওয়া কি সম্ভব?'

আমি ঠাণ্ডা সুরেই জবাব দিয়েছিলাম, 'বিজ্ঞান তো তাই দাবি করে।'

নন্দন বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল, 'তার মানে ল্যাবরেটরি টেস্টে উতরে যেতে পারলেই ব্যাপারটা সত্যি। না হলে বাজে, তাই তো?'

ঝোঁকের মাথায় জবাব দিয়েছিলাম, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

নন্দন আমাকে চাপা একটা ধমক দিয়ে বলল, 'তুই পৃথিবীর যে কোনও একজন বিজ্ঞানীকে ডেকে নিয়ে আয়। তারপর তাকে গবেষণাগারে প্রমাণ করে দিতে বল যে, আজ থেকে সাড়ে-তিনশো বছর আগে শাজাহান হিন্দুস্থানের সম্রাট ছিল। প্রমাণ দিতে

বল, ঔরঙ্গজিব সত্যি-সত্যিই হিন্দুস্থানের প্রতাপশালী সম্রাট ছিল। আমি জীবনীকারের লেখা, দলিল-দস্তাবেজকে প্রমাণ হিসাবে ধরছি না। যাকে বলে ল্যাবরেটরি টেস্ট— সেই গবেষণাগারে প্রমাণ করা হোক— সত্যি-সত্যি আকবর বলে একজন ছিল। প্রমাণ করা হোক, ঔরঙ্গজিব সম্রাট হয়ে হিন্দুস্থানে দাপটের সঙ্গে রাজত্ব চালিয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক প্রমাণকে কিন্তু প্রমাণ হিসেবে ধরব না। তার কারণ, একটা বিষয় সম্পর্কে পাঁচজন ঐতিহাসিকের পাঁচরকম মত থাকে। সবই হচ্ছে অনুমানসাপেক্ষ। দূর অতীতের কথা বাদ দে, হালের খবরই ধর না। কলকাতায় এখন যাকে বলে রাজনৈতিক সংঘর্ষ—তা তো লেগেই আছে। প্রায়ই খুনখারাপি, মারদাঙ্গা হয় এখানে-সেখানে। সেই সব খবরের রিপোর্ট বার হয় পাঁচটা স্থানীয় কাগজে। কিন্তু তুই মিলিয়ে দেখবি— একটা রিপোর্টের সঙ্গে আর একটা রিপোর্টের অনেক তফাত। পরস্পরবিরোধী রিপোর্টও বার হয়। মজার কথা, এইগুলোই পরে ঐতিহাসিক তথ্য হয়ে যাবে। আজ থেকে ধর দেড়শো-দুশো বছর বাদে পাঁচজন ঐতিহাসিক ওই দিনের পাঁচটা পুরনো খবরের কাগজের রিপোর্ট ধরে পাঁচরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছবে। পাঁচজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণেও বিস্তর গরমিল থাকে। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণ নয়— একজন বিজ্ঞানীকে স্রেফ গবেষণাগারের সাহায্য নিয়ে প্রমাণ করে দিতে হবে— শাজাহান ছিল, ঔরঙ্গজিব ছিল। পারবে প্রমাণ করতে? খুব তো বিজ্ঞান-বিজ্ঞান করছিস। বিজ্ঞানকে আমি মানি, আবার এটাও মানি বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে। কথায় কথায় বিজ্ঞান দেখাস না আমাকে।'

আমি আমার বন্ধু নন্দন সোমের একজন ভক্তই বলা যায়। নানা বিষয়ে অনেক কিছু ও জানে। কোনও জানাই ওর ভাসা-ভাসা নয়। প্রতিটি বিষয়ের গভীরে ঢোকে, আর সেই বিষয়ে ওর নিজস্ব একটা মতও তৈরি করে ফেলে। সেই মত কেউ খন্ডন করতে এলে ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। আমি তো সামান্য ব্যক্তি। ঠিক তর্ক নয়, একটু অন্যরকম গলায় প্রশ্ন করলাম, 'বিজ্ঞান কিন্তু বহুবার প্রমাণ করে দিয়েছে— লোকে যাকে এতকাল অলৌকিক ভাবত, তা অলৌকিক নয়।'

নন্দন কেমন যেন তাল ঠুকে বলল, 'খুব ভাল, বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারলে আমাদের মেনে নিতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু ষোলো আনা আপত্তি আছে প্রমাণ ছাড়াই কোনও বিষয়কে আজগুবি বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে। এই ধর সিটি অব অ্যাটলান্টিসের কথা। জানিস তো ব্যাপারটা?'

আমার একটু জানা-জানা মনে হচ্ছিল, কিন্তু তার বেশি আর কিছুই মনে পড়ছিল না। সুতরাং দুদিকে মাথা নাড়িয়েছিলাম আস্তে আস্তে।

নন্দন বলল, 'সিটি অব অ্যাটলান্টিস যে ছিল— সে ব্যাপারে পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিমত নেই। প্রাচীন বইপত্তরে ওই শহরটা নিয়ে নানা কথা লেখা আছে। সভ্য শহর, নানা রকম জ্ঞানের চর্চা হত ওখানে। কিন্তু গোটা শহরটাই লোপাট হয়ে গেছে। কেউ কেউ ধরে নিয়েছে, সমুদ্রের তলায় চলে গিয়েছে। কোন্ সমুদ্রে, কোন্ জায়গাটায়— বইপত্তর ঘেঁটে তার হিসেবপত্র বার করে সমুদ্রের তলায় বিস্তর অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানের তো অসম্ভব উন্নতি হয়েছে— চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে মানুষ গিয়েছে। ফিরেও এসেছে একেবারে অঙ্কের নিয়মে। এই বিজ্ঞানের

কিন্তু হারানো একটা শহরের কিছু প্রমাণ খুঁজে বার করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে কী প্রমাণ হয়? বিজ্ঞানটা এখনও পর্যন্ত যতটা এগিয়েছে, তার বহু গুণ এগনো বাকি আছে। তাই না?'

নন্দন আরও একবার নতুন করে ওর মতে ফিরিয়ে আনল আমাকে। নন্দনের বলার ভঙ্গিটা দুর্ধর্ষ। বলার ভঙ্গির মধ্যে গমগম করে আত্মবিশ্বাস। পরের পর উদাহরণ দিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, দৃষ্টান্ত খোঁজার জন্যে ওকে কখনও হাতড়াতে দেখিনি। জোরালো গলায় নন্দন বলল, 'ইয়েতিকে এখনও পর্যন্ত খাঁচায় পুরে পাঁচজনকে দেখানো যায়নি। যায়নি বলেই অনেকে বলতে শুরু করেছে, ইয়েতির কোনও অস্তিত্বই নেই। নেই কি?'

আমি নন্দনকে কথা বলাবার জন্যেই বললাম, 'দেখা তো যায়নি, দেখা না গেলে বলতেই হয়— ইয়েতি নেই।'

নন্দন আবার আমাকে ছোট্ট একটা ধমক মেরে বলল, 'কে বলল দেখা যায়নি? দেখা না গেলে ইয়েতির কথা উঠছে কেন? বেশ কয়েকজন অভিযাত্রী নিজের চোখে ইয়েতি দেখেছে। চেহারা বিশাল আকারের গরিলার মতো। গায়ে দৈত্যের মতো শক্তি। প্রকাণ্ড পাহাড়ি ইয়াকের টুঁটি একটানে ছিঁড়ে ফেলে। এসব দৃশ্য হিমালয়ের শেরপারা নিজের চোখে দেখেছে। অভিযাত্রীরা ইয়েতি দেখেছে। ইয়েতির পায়ের ছাপের ছবি তুলেছে। কিন্তু যেহেতু খাঁচায় পুরে চিড়িয়াখানায় ওদের রাখা যায়নি— বহু লোক বলতে শুরু করেছে— ইয়েতির অস্তিত্বই নেই। কোনও-কোনও পণ্ডিত ব্যক্তির সিদ্ধান্তঃ তুষারমানবের পায়ের ছাপের যে ছবিগুলো আনা হয়েছে, সেগুলো আসলে তুষার-ভালুকের পায়ের ছাপ। আমাদের পণ্ডিতদের একটা বড় অংশের দোষ কী জানিস, জ্ঞানের আওতায় না পড়লেও তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে আটকায় না। আমি তর্কের খাতিরে বলছি, সত্যি সত্যি কোনও ইয়েতিকে যদি পাওয়া নাও যায়, কখনও বলা যায় না যে, ইয়েতির অস্তিত্বই ছিল না।'

নন্দনের শেষ কথাটা ধাঁধার মতো ঠেকল। অবিশ্বাসীর গলায় বললাম, 'এটা আবার কেমন কথা! ইয়েতিকে ভবিষ্যতেও ধরা যাবে না, অথচ আমাদের ধরে নিতে হবে, ইয়েতির অস্তিত্ব ছিল!'

আত্মবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল নন্দনের চোখে-মুখে। 'হ্যাঁ, কখনও না পাওয়া গেলেও অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।'

'মানে?'

'এনডেন্‌জারড্ স্পিসিজের কথা জানিস তো? প্রাণিজগতের বেশ কিছু প্রাণী বিলুপ্ত হওয়ার মুখে। বহু প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেউ যদি বলে, ইয়েতির সংখ্যা কমতে কমতে দু-দশটায় এসে ঠেকেছিল; তারপর ওই প্রজাতি এখন শেষ হয়ে গেছে। ওই কথাটাকে কি উড়িয়ে দেওয়া যায়? উড়িয়ে দেওয়ার মতো কোনও প্রমাণ আছে কি?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথাটা কে বলেছে?'

'কেউ বলেনি, আমি বললাম, এখনই বললাম।'

আমার বন্ধুপ্রীতি এক ধাক্কায় বেড়ে গিয়েছিল অনেকখানি। দারুণ একটা কথা বলেছে তো নন্দন। বিষয়টাকে এ-ভাবেও দেখা যায়। সায় দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, তোর কথায় যুক্তি আছে।'

নন্দনের যুক্তি আমি ভাল মানুষের মতো মুখ করে মেনে নিলেও ও দৃষ্টান্ত দেওয়া থামাল না। 'এই যে ধর আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট, লোকের মুখে কথাটা ঘুরতে ঘুরতে এর একটা সংক্ষিপ্ত নামও হয়ে গিয়েছে— ইউ এফ ও। এটা যদি সত্যি বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে মানতে হয় গ্রহান্তরে প্রাণী আছে। কিন্তু এখানেও বাগড়া দিচ্ছে বিজ্ঞান। বলে, উড়ন্ত চাকি বলে যা ভাবা হচ্ছে তা হল— ছুটন্ত নক্ষত্রের কোনও টুকরো। বলছে বটে, কিন্তু প্রমাণ করতে পারছে না। দাবিটাকে যদি উড়িয়ে দিতে চাও, তাহলে প্রমাণ দাও। নেই, দেখিনি— এসব কথা কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নয়। প্রাণের অনুকূল আবহাওয়া দু-একটি গ্রহে অল্পস্বল্প পাওয়া গেছে। আমি বলব, এটাই অনেকখানি। বিশাল মহাকাশ তো মানুষের কাছে বিরাট এক বিস্ময়। ওই মহাকাশের এক কণা কি দু-কণা জানতে পেরেছে আমাদের বিজ্ঞান। ওই সামান্য জ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞানীদের কিন্তু বলতে আটকাচ্ছে না— গ্রহান্তরের প্রাণী আজগুবি কথা। উড়ন্ত চাকিতে গ্রহান্তরের প্রাণী আছে— এটা হল গিয়ে কল্পবিজ্ঞানের গল্প। আরে বাবা, অতীতের বেশ কিছু কল্পবিজ্ঞানের গল্পও তো পরে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পেয়েছে কি না বল?'

আলোচনাটাকে নন্দন হঠাৎই এমন একটা জায়গায় টেনে নিয়ে এল যে, যেখানে মুখ খোলার মতো বিদ্যে আমার নেই। কিন্তু আমি ভারিক্কি চালে প্রশ্ন করলাম, 'কী রকম?'

নন্দন সামান্য একটু উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'জুলে ভার্নের কথা ধর। এক-দেড়শো বছর আগে নিছক কল্পনার জোরে যে সব কথা বলেছিলেন, এই সেদিন সেগুলো বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল। সুতরাং কল্পবিজ্ঞানের গল্প নিয়ে ঠাট্টা করা আর যাকেই হোক, বিজ্ঞানীদের মানায় না। মানায় কি?'

সঙ্গে সঙ্গে আমি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললাম, 'না, মানায় না।'

আমার গলার স্বর আমার নিজের কাছেই আত্মসমর্পণের মতো ঠেকল। কিন্তু নন্দন শান্ত হল না। কেমন যেন তেড়েফুঁড়ে বলল, 'তুই বারমুডা ট্রাঙ্গেলের কথা ধর। জানিস নিশ্চয়ই ব্যাপারটা—।'

আমি সত্যিই জানি না, কিন্তু আমার পণ্ডিত বন্ধুকে কষ্ট না দেওয়ার জন্যে বললাম, 'জানি, মানে জানতাম। ঠিক কী যেন—।'

নন্দন বুঝি ঘোরের মাথায় ছিল। 'ওই যে বারমুডার অদ্ভুত তেকোনা এলাকা—। বিশাল ওই এলাকাটার রহস্য আজও সমাধান করতে পারেনি বিজ্ঞান। পারেনি, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এমন ভাব দেখায়, যেন এর মধ্যে সত্যি বলে কিছু নেই। যা বলা হয় তা নিছকই আজগুবি। তাই যদি হয়, তাহলে উধাও-হয়ে-যাওয়া ওই জাহাজ আর প্লেনগুলোর হদিশ বার করে দাও তোমরা।'

আসল রহস্যটা জানার জন্যে আমি ভেতরে-ভেতরে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। সুতরাং মিনমিন করে বললাম, 'বারমুডা ট্রাঙ্গেলে ঠিক কী হয় যেন....।'

'কী আবার হবে, যা বরাবর হয়ে আসছে, তাই। ট্রাঙ্গেলের নীচে সমুদ্র, ওপরে আকাশ। ওর কাছাকাছি গিয়ে পড়লেই জাহাজের ক্যাপ্টেন আর প্লেনের পাইলটদের বুক দুরদুর করে ওঠে। ট্রাঙ্গেলে ঢুকলেই সর্বনাশ।'

'কেন? সর্বনাশ কেন?'

'এক-আধটা নয়, বেশ কিছু জাহাজ আর প্লেন ওই ট্রাঙ্গেলে ঢুকে পড়ে আর বেরুতে পারেনি।'

'কেন?'

'কেন পারেনি, সেটাই তো রহস্য। ব্যাপারটা অনেকটা আমাদের মহাভারতের অভিমন্যুর মতো। পাইলট আর ক্যাপ্টেনের ওই তিনকোনা মস্ত এলাকাটায় ঢোকার বিদ্যে জানা আছে, কিন্তু বেরুবার বিদ্যে নেই।'

কৌতূহলের চাপে আমি এবার অকপট হলাম। 'কী হয় তখন জাহাজ আর প্লেনগুলোর? দুর্ঘটনায় পড়ে?'

'আরে দুর্ঘটনা ঘটলে সেটাকে তো আর রহস্য বলা হত না। কোথাও-কোথাও দুর্ঘটনা একটু বেশি হয়, তার জন্যে বিশেষ কোনও এয়ার বা সি রুট দায়ী। কোনও-কোনও রাস্তার তেমাথা বা চৌমাথার মোড়ে দুর্ঘটনা একটু বেশি হয়। তার নানা কারণও আছে। ট্রাফিক-পুলিশ জায়গাটাকে অ্যাকসিডেন্ট-প্রোন বলে মার্কাও দিয়ে দেয়। কিন্তু বারমুডা ট্রাঙ্গেলের ব্যাপারটা তো অন্যরকম।'

'কী রকম?' বুঝতে পারছিলাম আমার চোখমুখের অবস্থা বেশ করুণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু নন্দন আমার চোখ মুখের চেহারা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাল না। ও কেমন যেন ঘোরের মধ্যে ছিল। বলল, 'গোটা পৃথিবীর লোক এই জন্যেই তো এলাকাটাকে রহস্যময় তেকোনা বলে। নীচে সমুদ্র আর ওপরে আকাশ। ওই তিনকোনা জায়গাটায় ঢুকলে জাহাজ আর প্লেন বেমালুম উধাও হয়ে যায়। দুর্ঘটনা ঘটলে জাহাজ বা বিমানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যেত। হতাহতদের পাওয়া যেত—।'

'পাওয়া যায় না?'

'কী করে পাওয়া যাবে? ওটাই তো রহস্য। অদ্ভুত ওই তিনকোনা জায়গায় ঢোকার পরে বেশ কিছু জাহাজ আর প্লেন বেমালুম উধাও হয়ে গেছে। তাদের আর কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি।'

'উধাও! একেবারে উধাও! কোনও রকম খোঁজ পাওয়া যায়নি?'

'পেলে তো আর রহস্য বলা যেত না। এই রকম একটা রহস্যপূর্ণ এলাকা, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এটা মানতে চায় না। মানতে যদি না-ই চায়, ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে যাওয়া ওই জাহাজ আর প্লেনগুলোর খোঁজ এনে দিক।'

বিজ্ঞানীরা আমাদের প্রণম্য। বিজ্ঞানের চর্চা যত বেশি হবে, অগ্রগতির হারও তত বাড়বে, কিন্তু সেই বিজ্ঞানীদের কচু-কাটা করল নন্দন। সত্যিই তো, রহস্যের সমাধান করতে না পারলে সেটা 'আজগুবি' বলে উড়িয়ে না দিয়ে মেনে নেওয়াই উচিত।

আমাদের কথাবার্তা হচ্ছিল নন্দনের বসার ঘরে বসে। অত্যন্ত সুন্দর করে সাজানো ঘর, অগোছালো শুধু ওর লেখাপড়া করার টেবিলটা। রাজ্যের খবরের কাগজ, পত্রিকা আর বইতে টেবিলটা গিরিমালার মতো দেখতে হয়ে গেছে। ওই গিরিমালায় নিয়মিত ভ্রমণ করে নন্দন। নানা বিষয়ে ওর আগ্রহ, নানা বিষয়েই পড়াশুনো করে। কিন্তু ইদানীং অলৌকিক আর অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের দিকে একটু বেশি পরিমাণে ঝুঁকেছে।

কিছুক্ষণ আগে এক কাপ করে চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে আমাদের। নন্দন বলল, 'একটু

কফি খাওয়া যাক এবার। খাবি তো?'

একদিকে মাথা কাত করলাম আমি।

নন্দন ওদের কাজের ছেলেটাকে ডেকে বলল, 'দু-কাপ কফি ভাল করে বানিয়ে নিয়ে আয় তো। কফি খাওয়ার পরে উঠে পড়ব আমরা। তাড়াতাড়ি বানাবি।'

ওর উঠে পড়ার খবরটা আমি আগে জানতাম না। বললাম, 'তোর আজ ছুটি না?'

'হ্যাঁ, রোববারেই আমার ছুটি। তবে এডিটর আমার ঘাড়ে একট কাজ চাপিয়ে দিয়েছে। এডিটরের দোষ নেই। ঘাড়টা আমিই বাড়িয়ে দিয়েছি। বলা যেতে পারে, সেধে নেওয়া অ্যাসাইনমেন্ট। এখন তারকেশ্বরে যেতে হবে আমাকে।'

'তারকেশ্বরে?'

'হ্যাঁ।'

'তারকেশ্বর তো বহু দূর। ফিরবি কখন?'

'ফিরতে ফিরতে মনে হয় বেশ রাত্তির হয়ে যাবে। তোরও তো আজ ছুটি, চল না আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ ছুটি। কিন্তু সন্ধেবেলায় একটা নেমন্তন্ন আছে আমার—।'

'কোথায়?'

'ভবানীপুরে। আমার এক উত্তরপ্রদেশী সহকর্মীর সাদি কি সাল গিরা।'

'গেলে কিন্তু খুব এনজয় করতিস!'

'গান-বাজনার ব্যাপার নাকি?'

'না-না, ওসব না। তারকেশ্বরে যাচ্ছি এক ডাইনির সঙ্গে একটা একান্ত সাক্ষাৎকার নিতে।'

'ডাইনি!'

আমার চমকানোটা উপভোগ করল নন্দন, তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ, একেবারে পুরোদস্তুর ডাইনি। ভদ্রমহিলা একটা স্কুলে কিছুকাল পড়িয়েছেন। তারপর চাকরিবাকরি ছেড়ে এখন একেবারে ফুল-টাইম ডাইনি। বিবাহিতা। ছোট একটা ছেলেও আছে। কিন্তু বাড়িতে ডাইনিতন্ত্রের চর্চা বেড়ে ওঠায় স্বামী-বেচারা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়েছে।'

'বয়েস কত তোর ডাইনির?'

'আমার নয়, জনসাধারণের ডাইনি। শুনেছি, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর।'

'বয়েসটা তো ভাল নয়। তুই যাচ্ছিস, তোকে যদি ভেড়া বানিয়ে রেখে দেয়—।'

'রেখে দিলে রেখে দেবে। অনেকগুলো বছর তো মানুষ হয়ে কাটিয়ে দিলাম, বাকি জীবনটা না হয় ভেড়া হয়েই থাকব। গৃহপালিত ভেড়ার সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট কী জানিস— অন্নসংস্থানের জন্যে চাকরি করতে হয় না। ডাইনির দেওয়া কচি ঘাস খাব, আর সারা দিন ধরে ডাইনির মায়া দেখব। যাস একদিন দেখতে। ডাইনির ভীষণ নামডাক, বাড়ি চিনতে কোনও অসুবিধে হবে না।'

'তা না হয় হবে না। কিন্তু ডাইনির বাড়িতে গিয়ে যদি দেখি একটা নয়, পাঁচটা ভেড়া আছে; তোকে চিনব কী করে?'

নন্দন হেসে উঠে বলল, 'ভাল কথা বলেছিস। ডাইনির যদি সত্যিই ভেড়া বানাবার

ক্ষমতা থাকে, তাহলে আমি একা নই— আরও কম পক্ষে জনাচারেককে বানাবে। আমাকে চেনার রাস্তাটা এখনই বলে রাখছি তোকে। ওই পাঁচটা ভেড়ার মধ্যে যে ভেড়াটা তোকে দেখামাত্তর ছুটে এসে তোর বুকে পা তুলে দেবে— বুঝবি ওই ভেড়াটাই আমি।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'তোর স্বভাব তাহলে দেখছি ভেড়া হওয়ার পরেও পালটাচ্ছে না। চিরটাকাল ছড়ি ঘুরিয়ে গেলি, ভেড়া হওয়ার পরেও তুই আমার সঙ্গে প্রথম মিটিংয়েই আমার বুকের ওপর পা তুলতে চাস?'

'পা না তুললে তুই আমাকে চিনবি কী করে?'

'চেনার রাস্তাটা আমিই বলে দিচ্ছি। আমাকে দেখেই তুই ছুটে এসে আমার পায়ে মাথা ঘষবি। আমি তখন বুঝে নেব ওই ভেড়াটাই তুই।'

'উঁহু, পোষা ভেড়াদের গা ঘষা, মাথা ঘষার অভ্যেস থাকে। ও ভাবে হবে না। তুই ডাইনির বাড়িতে পা দেওয়া মাত্তর, যে ভেড়াটা গুঁতিয়ে তোকে মাটিতে ফেলে দেবে, বুঝবি সেটাই আমি।'

হেসে উঠেছিলাম আমি, আর ঠিক তক্ষুনি কাজের ছেলেটা দু-কাপ কফি দিয়ে গেল। কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, 'বল্ না, তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

'তারকেশ্বরে এবং ডাইনির সঙ্গে দেখা করতে।'

'সত্যি?'

'সত্যিই তাই। ইদানীং আমি এই ধরনের রিপোর্ট করার সুযোগ পেলেই করে থাকি। আগের সপ্তাহে পাথরপ্রতিমায় গিয়েছিলাম এইরকম একটা খবর আনতে। এক মহিলার উপর প্রতি মঙ্গলবার আর শনিবার দেবীর ভর হয়। ওই অবস্থায় উনি অনেককে ওষুধ দেন। সেই ওষুধে অনেক দুরারোগ্য রোগ নাকি সারে। হাইলি ইন্টারেস্টিং। আমাদের লাইফ-স্টাইলে এখনও কিন্তু মধ্যযুগের বেশ কিছু প্রভাব রয়ে গেছে। সংস্কার বল, কুসংস্কার বল— এগুলো আমাদের দেশের লোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও। বেশ কয়েক বছর ছিলাম রাজনৈতিক সংবাদদাতা। রাজনীতি ছাড়া আর কিছুকেই খবর বলে ধরতাম না। এখন ঠিক উল্টোটা মনে করি।'

'কেন?'

'মন্ত্রী আর বড় মাপের রাজনৈতিক নেতারা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কিন্তু বারোটার বেশি কথা বলে না। আমি তোকে এক, দুই, তিন, করে লিখে দেব, মিলিয়ে দেখিস। এই যখন রাজনীতির চেহারা, রাজনৈতিক সংবাদদাতা হয়ে কী হবে? ওদের ওই কথাগুলো বলা মানে আমার সেগুলো লেখা—। তার মানে গত কয়েক বছর ধরে আমিও ওই বারোটা কথা সংক্ষেপে কিংবা বিস্তারিত ভাবে লিখে গিয়েছি। কিন্তু রহস্যপূর্ণ ব্যাপারের মধ্যে ঢুকতে পারলে মজা আছে। তারকেশ্বরে এই যে ডাইনিটার কাছে যাচ্ছি— এ কিন্তু মার্কামারা ডাইনি নয়।'

'মার্কামারা ডাইনি নয় মানে?'

'মার্কামারা ডাইনিরা তুকতাক করে, লোকের ক্ষতি করে। কিন্তু এই ডাইনিটা লোকের ক্ষতির বদলে ভাল করে। অসুখ-বিসুখ সারায়, পারিবারিক ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার নিষ্পত্তি করে, জমির দখল নিয়ে লাঠালাঠি বন্ধ করে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া বাইরের কারও সঙ্গে দেখা

করে না।'

'তুই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিস?'

'করেছি, টেলিফোনে।'

'ডাইনির বাড়িতে টেলিফোনও আছে।'

'আছে। মডার্ন লিভিংয়ের নানা রকম ফেসিলিটিজ আছে ডাইনির বাড়িতে। পুরনো দিনের ডাইনি নয়, একেবারে মডার্ন ডাইনি। সাক্ষাৎকার দিতে চাইছিল না প্রথমে। বলছিল, যা বলার প্রেস কনফারেন্সে বলবে। আমি বললাম, তারকেশ্বরে প্রেস মিট করার বদলে আপনি বরং কলকাতায় আসুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তারপরেই তো আমাকে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়েছে।'

'তুই কি সত্যি-সত্যি কলকাতায় ওর প্রেস কনফারেন্সের ব্যবস্থা করবি?'

'যদি দেখি বুজরুক নয়, করে দেব। নেতাও ভোজবাজি দেখায়, ডাইনিও দেখায়। নেতারা যদি সাংবাদিক সম্মেলন করতে পারে, ডাইনিরাই বা পারবে না কেন?'

নন্দনের সঙ্গে তর্কে এঁটে ওঠা যায় না। ও যে-কোনও জিনিসই শূন্য থেকে শুরু করে ধাঁ-ধাঁ করে একশোয় পৌঁছে যেতে পারে।

ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'না, আর দেরি করা ঠিক হবে না। ঠিক সময়ে পৌঁছতে হবে।' প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কফি ও দু-চুমুকেই শেষ করে দিয়েছিল।

আমি উঠে পড়লাম। 'যা, ডাইনির সঙ্গে দেখা করে আয়। কাল টিফিন আওয়ার্সে পারলে তোর অফিসে যাব। সব শুনব তখন।'

নন্দন রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে বলল, 'ফেরার সময় ডাইনিকে একটা রিকোয়েস্ট করব ভাবছি।'

'কী রিকোয়েস্ট?'

'গল্পের বইতে পড়েছি, ডাইনিদের প্রিয় যান হল ঝাঁটা। গাড়ি-ঘোড়ার বদলে ঝাঁটায় চেপে আকাশপথে মুহূর্তের মধ্যে ওরা এখানে-সেখানে যায়। ওর কাছে একটা ঝাঁটা-লিফ্‌ট চাইব। বলব, আপনার মন্ত্র-পড়া ঝাঁটায় চাপিয়ে আমাকে কলকাতায় ফেরার ব্যবস্থা করে দিন। আমি বাড়ি ফেরার জন্যে আর ট্রেনে চাপব না।'

ওর কথা শুনে গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিলাম, কিন্তু নন্দন আর হাসল না। ওকে কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

'চলি তাহলে' বলে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম ওর বাড়ি থেকে।

।। দুই ।।

পরদিন অফিসে আমি কাজে মন বসাতে পারছিলাম না। বারবার নন্দনের ডাইনি-সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ইদানীং অলৌকিকের ওপর ওর একটু বেশি মাত্রায় আগ্রহ বেড়ে গেছে। এটা বোধহয় ঠিক নয়। কথায় বলে, ঝড়ে তাল পড়ে আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে। ঘটনাচক্রে ওই ধরনের কোনও ঘটনার মধ্যে পড়ে গেলে ও একটু

কুসংস্কারগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। অবশ্য ওর ওপর আমার অগাধ আস্থা। ঠিক সময় ঠিক কাজটা করে ও বিপদ কাটিয়ে উঠবে ঠিক।

টিফিন-আওয়ার্সের একটু আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম অফিস থেকে। নন্দনের অফিস আমার অফিস থেকে হাঁটা-পথের দূরত্বে। তবে এই সময় ওকে পাব কি না কে জানে! ওদের কাজের কোনও ঠিক নেই। যখন-তখন যেখানে-সেখানে ছুটতে হয়। কিন্তু আমার কপাল ভাল, নন্দনকে পেয়ে গেলাম অফিসে। আজ আবার ওদের দফতরটাও বেশ ফাঁকা-ফাঁকা। নন্দন টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন খোশগল্প জুড়েছিল। ইঙ্গিতে ও আমাকে বসতে বলল সামনের চেয়ারে।

টেলিফোনের গল্প একটু বাদেই ভাপা ইলিশের গল্পে পৌঁছে গিয়েছিল। নন্দন ভোজনরসিক, কিন্তু ও যে এত রান্নাবান্নাও জানে— আমি জানতাম না। ভাপা ইলিশের জন্যে ঠিক কী ধরনের ইলিশের প্রয়োজন, নন্দন শুরু করেছিল সেখান থেকেই। তারপর ইলিশ কাটা, তার পরে রান্না। রেসিপির বহরটা রীতিমত লম্বা। নন্দনের বর্ণনা নিখুঁত, আমি চোখের সামনে ভাপা ইলিশ দেখতে পাচ্ছিলাম পরিষ্কার।

লম্বা টেলিফোন কল। কথা শেষ হলে রিসিভার নামিয়ে রেখে মুচকি হেসে নন্দন জিজ্ঞেস করল, 'কার সঙ্গে কথা বলছিলাম বল্ তো?'

'রান্নার ব্যাপার যখন, কোনও বৌদি-টৌদি হবে হয়তো।'

দু-দিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে নন্দন বলল, 'হল না। আমি এতক্ষণ ধরে নেড়ুদার সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

'নেড়ুদা কে?'

'নেড়ুদা হল নিত্যানন্দ তরফদার।'

'সে আবার কে?'

অবাক হয়ে নন্দন বলল, 'নিত্যানন্দ তরফদার বলতে লোকে একজনকেই বোঝে— তিনি এই রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী।'

এবার আমার চমকে ওঠার পালা। 'তাই! তুই নেড়ুদা বলছিলি, তাই নিত্যানন্দ তরফদারকে ঠিক প্লেস করতে পারিনি।'

চওড়া মাপের একটা হাসি ফুটে উঠেছিল নন্দনের মুখে। 'আমার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক খুব কাছের। আড়ালে কিংবা টেলিফোনে আমি ওঁকে নেড়ুদা বলেই ডাকি। গল্পও হয় সব ধরনের।'

এবার সত্যিই আমার গা-ছমছম করে উঠল। পুলিশমন্ত্রী যখন একজন সাংবাদিকের কাছে ভাপা ইলিশের রেসিপি শেখেন তখন ধরে নিতে হবে— রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা খুব ভাল। কিন্তু তা তো দেখতে পাচ্ছি না। মারামারি, কাটাকাটি, চুরি-ডাকাতি তো বেড়েই চলেছে।

টুকরো-টুকরো কথায় সেটা জানাতেই নন্দন একটু চটে উঠে বলল, 'তোর হাতে একটা চার-হাতি লাঠি, আর তোকে বলা হচ্ছে— নীচে দাঁড়িয়ে মগডালের আম পাড়ো। সেটা কি সম্ভব।'

নন্দনের কথার কোনও মানে ধরতে পারলাম না আমি। ও নিজেও সেটা বুঝতে

পেরেছিল। আমাকে কয়েক মুহূর্ত ধাঁধার মধ্যে ফেলে রেখে সহানুভূতির গলায় বলল, 'এত বড় রাজ্য, এত লোক, এত সমস্যা— কিন্তু পুলিশ ফোর্স কতটুকু! গোটা রাজ্যে একসঙ্গে নানান ধরনের ঝামেলা শুরু হয়ে গেলে পুলিশের পক্ষে কি সেটা সামলানো সম্ভব? এ হল ওই চার-হাতি লাঠি নিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে মগডালের আম পাড়ার দশা। অ্যাডিকোয়েট পুলিশ ফোর্স দাও মন্ত্রীকে, তারপর দশ মুখে তার সমালোচনা করো। আমি পুরো ব্যাপারটা জানি বলেই বলছি, নেড়ুদা একটা মুহূর্তও নষ্ট করেন না। ওর নজর সবসময় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দিকে।'

নন্দন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি ওর গুণমুগ্ধ। আত্মবিশ্বাসে টান-টান বন্ধুর কথা শোনার পর পুলিশমন্ত্রীর আর কোনও দোষ দেখতে পেলাম না আমি।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল তারকেশ্বরের ওই ডাইনির সাক্ষাৎকার নিলি?'

'ধ্যুর, আর বলিস না! ছুটির দিনটা বেকার নষ্ট করলাম!'

'কেন? ডাইনিটা কি বুজরুক?'

'বুজরুক না খাঁটি বোঝার সুযোগই পেলাম না।'

'বাড়িতে ছিল না?'

'ছিল-ছিল, সেজেগুজে বসে ছিল। দরজা খুলে বেশ কায়দা করে আমাকে অভ্যর্থনাও জানিয়েছিল।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কী, ডাইনির বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আড়াই ঘণ্টা মশার কামড় খেয়েছি।'

একটু ছটফটে ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, কী হয়েছিল?'

রীতিমত হতাশ মানুষের গলায় নন্দন বলল, 'একগাদা পেশেন্ট এসে হাজির। সব মেয়েছেলে পেশেন্ট। তা, ডাইনি বলল, আপনি একটু বসুন। অনেক দূর-দূর থেকে এরা এসেছে, ওষুধটা দিয়ে দিই। বলো, এক-এক করে বলো, কী হয়েছে তোমাদের? তাই শুনে মাঝবয়সী একটা বউ একগলা ঘোমটা টেনে নিয়ে বলল: উনার সামনে বলব না। উনার সামনে মানে আমার সামনে। মেয়েলি রোগটোগের ব্যাপার। তা, আমি ভদ্রতা দেখিয়ে ডাইনিকে বললাম: আমি বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। আপনি রুগি দেখে নিন, দেখা শেষ হলে তবে আসব। সেই বাইরে দাঁড়ানোটাই আমার কাল হল। ডাইনির রুগি দেখা শেষ হল পাক্কা আড়াই ঘণ্টা পরে। ডাক পড়লে ভেতরে গেলাম। রুগি দেখে দেখে ডাইনিই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দেখি দুটো জেলুসিল খাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি নিজের ওষুধ খান না? বলল, খাই। তবে খুব দরকার পড়লে এগুলোও খাই। পৌনে তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেছে তখন। বললাম, আর দেরি হলে ফেরার ট্রেন পাব না। আমি পরে একদিন আসব আপনার কাছে। বলেই কেটে পড়েছি।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'আমি খুব আশা করে এসেছিলাম যে, ডাইনির মন্ত্রপড়া ঝাঁটায় চেপে তোর বাড়ি ফেরার গল্প শুনব।'

নন্দন কিন্তু হাসল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, 'এ ডাইনিটা কেমন

জানি না!'

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওখানে এক পরমাসুন্দরী মহিলা এসে হাজির হলেন। আমাদের দুজনের দিকে পালা করে বার-দুয়েক তাকিয়ে নেওয়ার পরে নন্দনের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি সাংবাদিক নন্দন সোমের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই—।'

নন্দন আমার পাশের চেয়ারটা ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন আপনি।'

'আপনিই কি—।'

ভদ্রমহিলাকে থামিয়ে দিয়ে নন্দন বলল, 'হ্যাঁ, আমিই নন্দন সোম। বলুন, কী দরকার আপনার?'

ভদ্রমহিলা একটু ইতস্তত করে আমার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে নন্দনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার অলৌকিক ধরনের কিছু-কিছু রিপোর্ট আমি পড়েছি খবরের কাগজে, তাই ভাবলাম এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একটু কথা বললে ভাল হবে।'

গাম্ভীর্য নন্দনের মুখে যেন চেপে বসেছিল। শুকনো গলায় বলল, 'বলুন।'

আর একবার ইতস্তত করার পর মুখ খুললেন ভদ্রমহিলা। 'খবরটা একটু অদ্ভুত ধরনের। আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি। কেউই করবে না, কিন্তু পরে—।'

'পরে কী?'

'আসলে রেসকোর্সের পাশের রাস্তাটা রাত দুটোর পরে একেবারেই নিরাপদ নয়।'

অদ্ভুত কথাটা শুনে আমি ভদ্রমহিলার দিকে ঘুরে তাকালাম।

নন্দন কপালে ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞেস করল, 'নিরাপদ নয়, মানে?'

এবার একটু বিব্রত দেখাচ্ছিল ভদ্রমহিলাকে। সেটা কোনওমতে কাটিয়ে নিয়ে বললেন, 'ওই সময় ওখানে ভূতের উপদ্রব হয়। অশরীরী কেউ এসে গাড়ির ড্রাইভার বা প্যাসেঞ্জারকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। এটা বিপজ্জনক। যে কোনও মুহূর্তে একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। আপনি যদি এই খবরটা লিখে দেন, গাড়ির ড্রাইভার বা প্যাসেঞ্জার সতর্ক হতে পারে। কিংবা ওই সময় কেউ আর ওই রাস্তায় যাবে না।'

কথাটা শুনে নন্দনের মুখে একটা ঠাট্টার হাসি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু ও গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'আপনি ভুল করেছেন। এটা খবরের কাগজের অফিস, আমরা ভূতের গপ্পো ছাপি না। আপনি ছোটদের কোনও পত্রিকা-অফিসে যান।'

ভদ্রমহিলার ফর্সা মুখে লালচে একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। উনি অপমানিত হওয়ার গলায় বললেন, 'যাঁদের একটু-আধটু শিক্ষাদীক্ষা আছে তাঁদের সবাই এই রকমের কথাই বলবে। কিন্তু আপনি কি সব কিছু যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন? পারেন না। আমার অহংকার ছিল, পারি। পারি ভেবেই পরশু রাত দুটোর সময় রেসকোর্সের পাশের রাস্তায় গিয়েছিলাম—।'

'আপনি একা?'

'হ্যাঁ, যাত্রী বলতে আমি একাই। গাড়ি চালাচ্ছিল আমার ট্যাক্সির ড্রাইভার শিবু। ও ওই রাস্তায় দেড় মাসের মধ্যে দুবার ভূতের খপ্পরে পড়েছিল। আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশনে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম— একই ধরনের অভিজ্ঞতা আরও কয়েকজনের হয়েছে—।'

নন্দনের চোখমুখ এবার চকচকে হয়ে উঠেছিল। ও বলল, 'দাঁড়ান-দাঁড়ান, পুরো ব্যাপারটা শুনি। আপনার নাম কী?'

'অনসূয়া রায়।'

'কোথায় থাকেন?'

'বেলগাছিয়ায়।'

'আপনার ট্যাক্সির ড্রাইভার, মানে—।'

'হ্যাঁ, ট্যাক্সিটা আমারই। একবার ভেবেছিলাম ট্যাক্সি-ড্রাইভারি করব। কয়েকটা দেশে মেয়েরা তো ট্যাক্সি চালায়। তা যাই হোক, ড্রাইভারি আর করা হয়ে ওঠেনি। আমার ট্যাক্সি চালায় শিবু নামের অল্পবয়সী একটা ছেলে। ভাল ছেলে।'

ভদ্রমহিলার কথায় আর একটা চমক খেলাম। পোশাক-আশাক দেখলে বোঝা যায় রীতিমত ধনী। এঁর ইচ্ছে ছিল কলকাতার রাস্তায় ট্যাক্সি চালাবার! বললাম, 'আপনি নিজে ট্যাক্সি চালাবার কথা ভেবেছিলেন!'

'কেন, অসুবিধেটা কোথায়?'

'না, অসুবিধে নেই। তবে বিপদ-আপদ, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে—।'

একটু বিরক্ত মুখে উত্তর দিলেন অনসূয়া রায়। 'অন্য পেশার মেয়েরা কি বিপদে পড়ে না? আত্মরক্ষার কায়দা আমার জানা আছে। আমি ক্যারাটে জানি। ব্ল্যাকবেল্ট পেয়েছি। নিয়মিত ভলিবল খেলি। ছুটিছাটায় ট্রেকিং করি, রক-ক্লাইম্বিং করি।'

আমি আড়চোখে ভদ্রমহিলার চেহারা আগাগোড়া একবার দেখে নিলাম। কাটা-কাটা চোখমুখের রূপসীটি বেশ লম্বা। ছিপছিপে চেহারা। কব্জি চওড়া। বয়েস কত হবে? বড় জোর তেইশ-চব্বিশ। কথাবার্তায় বেশ সহজ-স্বাভাবিক, কিন্তু খেয়াল করলেই বোঝা যায়—ভেতরের মানুষটি একটু একরোখা প্রকৃতির।

মন্টু নামের ছেলেটা দুপুর দুটোর চা বিলি করতে এসেছিল। নন্দনের ইঙ্গিতে ও এই টেবিলে তিন কাপ রেখে গেল ঠক্-ঠক্ করে। খবরের কাগজের অফিসে জোয়ার-ভাটার খেলা চলে প্রায়ই। কখনও বেশির ভাগ টেবিল উপছে পড়ে ভিড়ে, কখনও সব খালি হয়ে যায় একদম। এখন ভাটার টান। দফতরে লোকজন বেশি নেই। মস্ত জানলার বাইরের আকাশ কখন যেন কালো হয়ে গেছে। বৃষ্টি নামতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। পরিবেশ আচমকা বুঝি কিছুটা অলৌকিক গল্প বলার মতো হয়ে উঠেছিল।

ভদ্রমহিলা কী যেন বলতে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। থেমে যাওয়ার কারণটা আন্দাজ করে নন্দন বলল, 'এ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু দীপ। আপনি সব কথা এর সামনে বলতে পারেন স্বচ্ছন্দে। কাছেই ওর অফিস। আপনিও বোধহয় চাকরি-টাকরি করেন?'

'না, আমি ছোটখাটো একটা অ্যাড্ এজেন্সি চালাই। ম্যাডান স্ট্রিটে আমার অফিস।'

'আর ট্যাক্সির ব্যবসা?'

'ব্যবসা ঠিক নয়, শখ। বিদ্‌ঘুটে শখ বলতে পারেন। শিবু চালায়।'

ট্যাক্সির কথায় অনসূয়া রায়ের বোধহয় ডিজেল আর তেলের গন্ধের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। উনি মুঠোর মধ্যে ভাঁজ-করা রুমাল দিয়ে নাক মুছলেন। এক রত্তি ওই রুমাল

থেকে দামি সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'আমি পরশু রাতের ঘটনাটার কথা বলব কি এবার?'

আমি আর নন্দন একইসঙ্গে সায় দিয়েছিলাম, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়ই।'

ভদ্রমহিলা চায়ের কাপে একবার ঠোঁট ছুঁইয়ে নিয়ে বললেন, 'শুনেছি, আমার ট্যাক্সির ড্রাইভার শিবু নেশাটেশা করে না। কিন্তু ও যখন মাঝরাত্তিরের ওই ভূতের গল্প শোনাল, আমি ধরে নিলাম— ছোকরা নেশা ধরেছে। এ লাইনে বেশির ভাগ ড্রাইভারই ড্রিংক করে। তা করুক, কিন্তু নেশা করে গাড়ি চালানো একটা মস্ত বড় অফেন্স। নিজে মরবে, প্যাসেঞ্জারদেরও মারবে। আমার গাড়ি ইনসিওর করা আছে, সুতরাং ড্যামেজ্‌ড গাড়ির ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে কোনও ইনসিওর কোম্পানি তো তার প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমার কোনও ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। আমি নিজেও ড্রিংক করি, তবে পরিমাণে খুব অল্প। শিবুর মুখে ওই ভূতের গল্প শোনার পরে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম: শিবু, তুই কি মদ ধরেছিস? শিবু জিবটিব কেটে জবাব দিয়েছিল: বিশ্বাস করুন দিদি, আমি জীবনে একদিনের জন্যেও মদ ছুঁইনি। মনে হল, সত্যি কথাই বলছে ও। তখন জিজ্ঞেস করলাম: তোর কি মাথাটাথা ঘোরে? বেশি খাটাখাটনি, ওদিকে খাওয়াদাওয়া কম—। অনিয়ম, অত্যাচার করলে মাথা ঘুরতে পারে। সেই অবস্থায় ভুল দেখাটা অস্বাভাবিক নয়।'

'কী দেখেছিল ও?'

আমার কৌতূহলে জল ঢেলে দিয়ে অনসূয়া রায় ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিলেন, 'কিচ্ছু না।'

'কিছুই না?'

'না, কিচ্ছু দেখেনি ও। রাত দুটোর সময় রেসকোর্সের পাশের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাবার সময় শিবুর মনে হয়েছিল, কে যেন ধাক্কা দিয়ে ওকে গাড়ির বাইরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ভাগ্যিস তখন রাস্তায় অন্য গাড়ি ছিল না, থাকলে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারত। শিবু ভেবেছিল, নিশ্চয়ই ওটা ওর মনের ভুল। কিছুদিন বাদে ওই সময় ওই রাস্তা দিয়ে আবার গাড়ি নিয়ে ফিরছিল, সেদিনও ওর ঠিক একই ধরনের অভিজ্ঞতা। অতি কষ্টে নিজের সিটে চেপে বসে স্টিয়ারিং আঁকড়ে কোনওমতে বেঁচে ফিরে এসেছে। দুদিনের একদিনও ওর গাড়িতে প্যাসেঞ্জার ছিল না। গাড়ি গ্যারাজ করবে বলে ফিরছিল।'

'আপনার গাড়ির গ্যারাজ কোথায়?'

'আমার বাড়িতেই।' উত্তর দিয়ে অনসূয়া হ্যান্ডব্যাগ খুলে দুটো ভিজিটিং কার্ড আমার আর নন্দনের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কার্ডদুটো নিলাম আমরা। সুদৃশ্য কার্ড। কার্ডে ভদ্রমহিলার বাড়ি আর অফিসের ঠিকানা, ফোন নাম্বার লেখা।

কার্ডদুটো আমরা উল্টেপাল্টে দেখে পকেটে রেখে দেওয়ার পরে অনসূয়া বললেন, 'শিবুকে নিয়ে আমি বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম। নেশাটেশা করে না, শরীর অসুস্থ হয়নি; তাহলে জেগে-জেগে এমন দুঃস্বপ্ন দেখছে কেন?'

'হয়তো খুব ভূতের গল্পটল্প পড়ে।'

'হ্যাঁ, তাও ভেবেছিলাম একবার। কিন্তু জিজ্ঞেস করে জানলাম, পড়াশুনোর কোনও

পাট নেই ওর। অবসর সময়ে টিভি দেখে, সিনেমাও দেখে মাঝেমধ্যে। নেশা বলতে মাছ-ধরা।'

নন্দন হেসে বলল, 'মেছো ভূতও আছে বলে শুনেছি। তবে তারা তো খালবিলে থাকে। মাঝরাতে রেড রোড বা চৌরঙ্গিতে ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা জুড়তে আসবে না।'

নন্দনের কথায় অনসূয়া রায় হাসলেন না। হাতের মুঠোর সুগন্ধী রুমাল বার করে নাকের দুপাশের ঘাম মুছলেন। তারপর থমথমে গলায় বললেন, 'আমার ট্যাক্সি-ড্রাইভারের যদি মাথার দোষ দেখা দেয় আমার উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া ছেলেটার বয়েসও বেশ কম, একুশ-বাইশ হবে। বিধবার একমাত্র ছেলে। বাড়ির রোজগেরে মানুষ বলতে ও ছাড়া আর কেউ নেই। শিবুকে ছাড়িয়ে দিতে মন চাইছিল না। কিন্তু যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে দু-দুবার ভূতের খপ্পরে পড়েছে, তাকে গাড়ি চালাতে দেওয়া ঠিক হবে কি! সুতরাং—।'

'ছাড়িয়ে দিলেন তো? ঠিক করেছেন। পাগলের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দেওয়া ঠিক নয়। ও শুধু নিজেই মরবে না, আরও পাঁচজনকে মারবে।'

নন্দনের কথায় অনসূয়া একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'না, ওকে আমি ছাড়াইনি। ব্যাপারটা নিয়ে একটু খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে ট্যাক্সি ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশনের দফতরে গিয়ে হাজির হলাম একদিন। তা প্রসঙ্গ তুলতেই দু-তিনজন বেশ জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ, মাঝরাত্তিরে জায়গাটার দোষ আছে। মাঝে উপদ্রব খুব বেড়ে ছিল, তবে সে তো বেশ কয়েক বছর আগের কথা। হালে আবার শুরু হয়েছে নাকি? এর জবাবে কী বলব বলুন?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কয়েক বছর আগে এই ধরনের একটা খবর বেরিয়েছিল কাগজে। তাই না নন্দন?'

নন্দন বিরক্ত মুখে জবাব দিল, 'জানি না।'

গল্পের নেশা আমাদের বেশ চেপে ধরেছিল, কিন্তু নন্দন গম্ভীর মুখে বার-দুয়েক ঘড়ি দেখল। ওর ভঙ্গি দেখে যে-কেউ বুঝতে পারবে, এসব গালগপ্পো ওর ভাল লাগছে না। ওর হাতে দরকারি কিছু কাজ আছে।

কিন্তু নন্দনের এই ব্যস্ততাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিলেন না অনসূয়া। খুব চাঁছাছোলা গলায় ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আগামী কাল রাত দুটোর সময় ট্যাক্সি নিয়ে রেসকোর্সের পাশের রাস্তায় যাব। আমার অনুরোধ, আপনিও আমার সঙ্গে চলুন।'

প্রস্তাব শুনে চমকে উঠল নন্দন, 'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ, অসুবিধেটা কোথায়! আপনি রিপোর্টার। পুরো ব্যাপারটা দেখেশুনে রিপোর্ট লিখবেন। রাত দুটোর ব্যাপার তো, আমি আপনার বাড়ি থেকে আপনাকে ট্যাক্সিতে তুলে নেব। আপনার বাড়ির ঠিকানাটা বলুন।'

নন্দন অত্যন্ত তুখোড় ছেলে, কিন্তু ভদ্রমহিলার কথা শুনে রীতিমত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল।

অনসূয়ার কথা বলার ধরনটা ভারী সুন্দর। সুন্দর করে হেসে বললেন, ''আমার কথাগুলো আপনার আজগুবি ঠেকছে তো? ঠেকাটাই স্বাভাবিক। শিবুর কথা শুনে প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু পরশু রাত দু'টোয় রেসকোর্সের পাশের রাস্তায় আমার যে

অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা তো আর আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে পারি না।"

'কী অভিজ্ঞতা?'

নন্দনের প্রশ্নের জবাবে থমথমে মুখ করে ভদ্রমহিলা বললেন, 'সে অনেক কথা, কাল রাত্তিরে রেসকোর্সের দিকে যাওয়ার পথে আপনাকে বলব। দিন, আপনার ঠিকানাটা দিন।'

নন্দনের শরীরে বোধহয় সাড় ছিল না, ও কেমন যেন আদেশ পালন করার ভঙ্গিতে বুকপকেট থেকে একটা কার্ড বার করে ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে দিল।

ভদ্রমহিলা কার্ডে দ্রুত চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, কাল রাতে আপনার বাড়িতে যাওয়ার আগে আমি একটা ফোন করে নেব। চলি এখন।'

অনসূয়া রায় চেয়ার ছেড়ে ওঠার মুখে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল। জানলা দিয়ে ওই বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'এর মধ্যে বেরুবেন কী করে? একটু বসে যান।'

'না, আমার কোনও অসুবিধে হবে না।' উত্তর দিয়ে লম্বা পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা।

।। তিন ।।

পরদিন আমার আর তর সইছিল না। আমাদের অফিসে টিফিন-আওয়ার্স শুরু হওয়ার একটু আগেই বেরিয়ে পড়ে ধরতে গেলে ছুট লাগালাম নন্দনের অফিসের দিকে। কপাল ভাল ওকে পাওয়া গেল। আমাকে দেখে একগাল হেসে নন্দন বলল, 'আয়, বোস্।'

উত্তেজনা গোপন করা আমার পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল। বসার আগেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই গিয়েছিলি?'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার, রাত দুটোয় রেসকোর্সের পাশের রাস্তায়?'

নন্দন চাপা গলায় আমাকে একটা ধমক দিয়ে বলল, 'তোর সত্যি মাথা খারাপ।'

'মাথা খারাপ! কেন?'

'চিনি না, শুনি না; উটকো একটা মেয়েছেলের সঙ্গে রাতদুপুরে ভূত দেখতে যাব আমি! এ তো একজনকে ফাঁসাবার তাল। ধর্, পুলিশের হাতে ধরা পড়লাম। তারপর মান-সম্মানের ভয় বিসর্জন দিয়ে কনটেস্ট করলাম। আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে জিজ্ঞেস করল: আপনি মাঝরাত্তিরে এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে ময়দানে কী করছিলেন? আমি কী জবাব দেব তখন? বলব: হুজুর, আমি ওর সঙ্গে ভূত দেখতে বেরিয়েছিলাম। শোনো বাবা, এই পেশার সুবাদে আমি বহু ধরনের লোকের সঙ্গে ওঠাবসা করি। হ্যাঁ, অলৌকিক ব্যাপারের দিকে আমার একটু দুর্বলতা আছে, কিন্তু আমাকে টুপি পরানো অত সহজ নয়।'

চেয়ারটা টেনে নিয়ে আমি চুপ করে বসে থাকলাম কয়েক মুহূর্ত। সত্যি, এ-লাইনে তো একবারও ভাবিনি। ভদ্রমহিলাকে একটু ছিটিয়াল বলে মনে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এর ভেতরে যে আর কোনও চাল থাকতে পারে— সেটা আমার মাথাতেই আসেনি।

নন্দন আমার ঝিমিয়ে-পড়া ভাবটা উপভোগ করার পরে হাসতে হাসতে বলল, 'দুনিয়াটা

বড় অদ্ভুত জায়গা দীপকুমার। এখানে দুই আর দুই যোগ করলে যোগফল কদাচিৎ চার হয়। স্কুল-কলেজের পরীক্ষা পাশ করতে গিয়ে আমরা যা শিখি, জীবনের পরীক্ষায় তার কোনওটাই কাজে লাগে না।'

একটু নড়েচড়ে বসতেই আমার পুরনো কৌতূহল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল আবার। জিজ্ঞেস করলাম, 'অনসূয়া রায় কাল রাতে ফোন করেছিল তোকে?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলে কাটালি তুই?'

'কাল রাতে একবারও ফোন তুলিনি আমি। বাড়ির সবাইকে বলে রেখেছিলাম, এই নামের কোনও মহিলা ফোন করলে যেন বলে দেয়— জরুরি একটা কাজে আমাকে কলকাতার বাইরে চলে যেতে হয়েছে। ফিরতে ফিরতে দিনসাতেক লেগে যাবে।'

নন্দনের উপস্থিত-বুদ্ধিতে আর একবার চমৎকৃত হলাম আমি। ওর জায়গায় আমি থাকলে এতক্ষণে নির্ঘাত একটা তালগোল পাকিয়ে বসতাম! বাহবা দেওয়ার গলায় বললাম, 'তোর চোখ আছে সত্যি। মহিলা যে অমন জাঁহাবাজ, আমার কিন্তু একবারের জন্যেও মনে হয়নি।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল নন্দন। 'আমি কিন্তু একবারও বলিনি— মহিলা জাঁহাবাজ। হ্যাঁ, ব্ল্যাকমেল করতে পারত, আবার—।'

'আবার কী?'

'খুব খেয়ালি স্বভাবের। চেহারা আর পোশাক-আশাক দেখলেই বোঝা যায়, বড়লোকের মেয়ে কিংবা বউ। ট্যাক্সির ড্রাইভার হয়তো গাঁজা খেয়ে কোনও গল্প বলেছে, ভদ্রমহিলা সেটাকেই বিশ্বাস করে বসে আছেন।'

আমি মনে মনে আবার অনসূয়া রায়ের দলে চলে গিয়েছিলাম। বললাম, 'তোর এই শেষের কথাটাই ঠিক। গাঁজাখোর ড্রাইভারর কথায় বিশ্বাস করে ভদ্রমহিলা মাঝরাতে ওইরকম একটা বাজে জায়গায় গিয়েছিলেন। কাল যদি আবার ঝোঁকের মাথায় ওইরকম বিদ্‌ঘুটে একটা অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে—। যতই ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন হোক না কেন, মেয়েছেলে ইজ মেয়েছেলে। তিন-চারটে গুণ্ডা যদি আচমকা দু-দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ব্ল্যাকবেল্টের বিদ্যে কী কাজে লাগবে বল্? তুই এক কাজ কর, লালবাজারে একবার ফোন করে দেখ না কাল রাত্তিরে ওই ধরনের কোনও ইনসিডেন্ট-টিনসিডেন্ট ঘটেছে কিনা—।'

নন্দন ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, 'এই ধরনের খবরগুলো নাইট ডিউটির রিপোর্টার্রি নেয়।'

আমার শরীরের অস্থিরতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। বললাম, 'এক কাজ করবি?'

'কী?'

'তুই অনসূয়ার বাড়িতে কিংবা অফিসে একবার ফোন কর না—।'

নন্দন একটা চাপা ধমক দিয়ে বলল, 'তুই খেপেছিস! কাল রাত্তিতে আমার বাড়ি থেকে ওকে জানিয়েছে— সাতদিনের জন্যে অফিসের কাজে আমি বাইরে গিয়েছি, আর আজকেই ফোন!'

ঠিকই তো, কিন্তু কথাটায় সায় দিতে পারলাম না আমি।

নন্দন কী বুঝল কে জানে! আমার চোখমুখ বেশ খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'তোর

দুশ্চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। আমার মনে হয়, ভদ্রমহিলা বহাল তবিয়তেই আছেন। দিন-সাতেক বাদে ওঁর কাছ থেকে একটা অন্তত টেলিফোন-কল পাব। আমার ধারণা, এই ব্যাপারটার সঙ্গে ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, আমাদের আরও কিছুটা জড়িয়ে পড়তে হবে।'

।। চার ।।

নন্দন একেবারে নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। আটদিনের মাথায় অফিসে বসে নন্দনের ফোন পেলাম। নন্দন জিজ্ঞেস করল, 'আজ সন্ধেয় কী করছিস?'

'কেন?'

'সেই মহিলা, অনসূয়া রায়, ফোন করেছিল। ওর বাড়িতে আজ আমাদের ককটেল আর ডিনারের নেমন্তন্ন। সেই ভূতের ব্যাপারে উনি নাকি ইতিমধ্যে অনেকটা এগিয়েছেন, ওই সব গল্প শোনাতে চান। তা, আমি তোর কথা বলে বলেছি— ও ফ্রি আছে কি না জেনে নিয়ে আপনাকে রিং ব্যাক করছি।'

একটুতেই আমার উত্তেজিত হয়ে ওঠার রোগ আছে। বললাম, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুই এক্ষুনি কনফার্ম করে দে। এই ধরনের নেমন্তন্নে কাজ কামাই করেও যাওয়া যায়।'

"ঠিক আছে, তুই তাহলে সাড়ে-ছ'টা নাগাদ আমার অফিসে চলে আয়।"

টেলিফোন নামাবার পরেই ভদ্রমহিলার মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। কাটা-কাটা চোখমুখ। একটু আদুরি-আদুরি ভাবের সঙ্গে কাঠিন্যও মিশে আছে খানিকটা। বড়লোকের মেয়ে কিংবা বউ। চোখে পড়ার মতো রূপসী। কিন্তু খ্যাপা কি?

প্রশ্নটা নাকের সামনে কিছুক্ষণ ঝুলিয়ে রাখার পরে আমিই রায় দিলাম— না, ওর মধ্যে কোনও খ্যাপামি নেই।

ঠিক সাড়ে-ছ'টার সময় নন্দনের অফিসে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমি। হাতের কাজ সারতে ওর আরও আধঘণ্টা লেগে গিয়েছিল। সাতটায় টেবিলের কাগজপত্তর ড্রয়ারে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে বলল, 'চ।'

অফিস থেকে বেরিয়ে 'প্রেস' লেখা গাড়িতে উঠে নন্দন বলল, 'এই নেমন্তন্নে যাওয়াটা আমার অফিসিয়াল অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে পড়ে গেছে।'

'কীরকম?'

'আমাদের এডিটরকে পুরো ব্যাপারটা বললাম। উনি শুনে বললেন: বাহ্! এ তো আপনারই সাবজেক্ট। আপনি এক কাজ-করুন, ভদ্রমহিলার কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা শুনে নিয়ে বেশ রসিয়ে-রসিয়ে একটা স্টোরি লিখুন। আমি এটাকে আমাদের কাগজের প্রথম পাতার খবর করতে চাই। আজকাল গাঁজাখুরি খবরের চাহিদা খুব বেড়ে গেছে। আপনি একজন ফোটোগ্রাফার নিয়ে যান সঙ্গে।'

'নিলি না?'

নন্দন হেসে উঠে বলল, 'নিয়ে কী করব? ভূতের ছবি তুলব?'

সেন্ট্রাল এভিনিউয়ে এইসময় একটু জ্যাম থাকে, কিন্তু আজ মোটামুটি ফাঁকাই ছিল। ভদ্রমহিলার সেদিনের সেই কথাগুলো আমার মাথায় ঘুরছিল। বললাম, 'আচ্ছা, আজ নেমন্তন্ন খাওয়ানোর পরে ভদ্রমহিলা যদি তোকে ভূত দেখাতে নিয়ে যেতে চান—। যাবি?'

'যাব, ভূতকে নিয়ে রিপোর্ট লেখা আমার এখন কাজের মধ্যে পড়ে গেছে। তুইও যাবি আমাদের সঙ্গে।'

'আমি! কেন?'

'তোকে সঙ্গে নেব খবরের কাগজের স্বার্থে। আমি লিখব ভূত শুধু আমি একাই দেখিনি, অমুক অফিসের অমুকচন্দ্র অমুকও দেখেছেন। একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী থাকলে রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে।'

'কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিতে ভদ্রমহিলা যদি রাজি না হন?'

'খুব হবে। রাজি করিয়ে ছাড়ব। মোদ্দা কথা, ওই পাগলির সঙ্গে মাঝরাত্তিরে আমি একা-একা ভূত দেখতে যাব না।'

ঘুরে বসে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, তোর কী মনে হয়— অনসূয়া রায়ের মাথায় কি একটু ছিট আছে?'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল নন্দন, 'একটু নয়, অনেকখানি। ওই ছিটে দু-তিনটে ফ্যামিলির পুজোর জামাকাপড় হয়ে যাবে।'

একটু বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, 'অনসূয়াকে যদি তোর সত্যিই পাগলি বলে মনে হয়, তুই ওর নেমন্তন্ন নিলি কেন?'

হাসিটা নন্দনের গলার মধ্যে থেকেই গিয়েছিল। মজার ভঙ্গিতে বলল, 'আমাদের পেশাটা বড় অদ্ভুত। এখানে বাতিল-করা জিনিস বলে কিছু নেই। ওই যে কবিতাটা আছে না— যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই; পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন! তা, ওই ছাই ঘাঁটতে গিয়ে আমি দু-তিনবার দুর্দান্ত সব খবর পেয়ে গিয়েছি— যাকে বলে এক্সক্লুসিভ।'

আমার বিরক্তির মাত্রা আর একটু বেড়ে গিয়েছিল। বললাম, 'তোর কি মনে হয় এখানেও ওই ধরনের কোনও খবর পাবি?'

'নাহ্, বড় কিছু পাব না। সম্পাদকের নির্দেশ আছে একটা গা-ছমছমে ভূতের খবর বানাবার— সেটা বানাব। পরে একটা ফলো-আপ স্টোরি করব। আমাদের দেশে সাইকিয়াট্রিক পেশেন্টের সংখ্যা বেশ বেড়ে গেছে। সমীক্ষা-গোছের রিপোর্ট, নাম না করে অনসূয়া রায়ের কেসটাও ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দেব।'

নন্দনকে বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল। আমি মনে মনে অনসূয়া রায়ের একজন প্রবল সমর্থক হয়ে পড়লেও নন্দনের কথাগুলো উড়িয়ে দিতে পারছিলাম না।

গাড়িতে ওঠার মুখেই নন্দন ড্রাইভারকে বলে দিয়েছিল কোথায় যেতে হবে। ড্রাইভার উত্তর কলকাতারই বাসিন্দা, সুতরাং গাড়ি তরতর করে এগিয়ে চলেছিল ঠিক পথে।

বেলগাছিয়ার বিশাল এক ভিলার সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। এই বাড়িতেই অনসূয়া রায়রা থাকে। বাড়ির চেহারা দেখলেই বোঝা যায় তিন পুরুষের ধনীর বাড়ি।

পরিষ্কার খাটো ধুতি আর হাফ-হাতা সাদা শার্ট পরা বাড়ির কাজের লোক বেশ আপ্যায়ন

করে বসার ঘরে দুই অতিথিকে বসাল। মস্ত সিটিং-রুম পুরনো দিনের শৌখিন আসবাবপত্রে ভরা। দেয়ালে পুরনো দিনের বাঁধানো ফোটোগ্রাফ, পেন্টিং। মাঝামাঝি জায়গায় ঢাউস এক ফ্রেমের মধ্যে শোভা পাচ্ছে পুরনো দিনের এক রায়বাহাদুরের উদ্দেশে লেখা অভিনন্দন-পত্র। চারদিকে চোখ ঘোরালেই বোঝা যায়, একদা এ-ঘরে চোগা-চাপকান পরা গৃহস্বামী আর লালমুখো ব্রিটিশ সাহেব-মেমের আড্ডা বসত।

আমরা ঘরে বসার মিনিট-দুয়েক বাদে অনসূয়া রায় এসে বললেন, 'বাড়ি চিনতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

আমরা দুজনেই প্রায় একসঙ্গে জবাব দিলাম: ন্‌না, একদম নয়।

অনসূয়া আমাদের সামনের চেয়ারে বসে বললেন, 'আপনারা এসেছেন এ আমার বিরাট সৌভাগ্য। আসলে বাড়িতে কাউকে আসতে বললে তাঁরা না আসা পর্যন্ত আমি ভেতরে-ভেতরে অদ্ভুত একটা টেনশনে ভুগি। কী খাবেন বলুন?'

আমি বললাম, 'ন্‌না ঠিক আছে—।'

আমার কথাটার কোনও মানেই হয় না। নন্দন এটা চাপা দেওয়ার জন্যেই বোধহয় ঝরঝরে গলায় বলে উঠল, 'আপনি ভালবেসে যা খাওয়াবেন, তাই খাব।'

খাটো ধুতি আর সাদা হাফ-শার্ট বোধহয় এ-বাড়ির কাজের লোকদের ইউনিফর্ম। একজনের জায়গায় এবার তিনজনকে দেখা গেল। পাকা ওয়েটারের কায়দায় তিনজন নিঃশব্দে টেবিল সাজিয়ে ফেলল। স্কচের বোতল থেকে দুটো বড় একটা ছোট পেগ স্কচ ঢালা হল। স্কচের সঙ্গে বরফ।

ছোট পেগটা অনসূয়া নিলেন, বড়দুটো আমাদের। কাজু বাদাম, চানাচুর, সাদা শামুকের মতো দেখতে পাঁপড় রাখা হল চেয়ারের পাশের ছোট টেবিলে। একটু পর-পর নানা ধরনের ডিশ ঘোরানো হচ্ছিল। কোনওটায় মাটন বল, কোনওটায় ফিস ফিঙ্গার, কোনওটায় মশলাদার চিংড়ি।

গ্লাস শেষ হলেই ভর্তি করে দেওয়া হচ্ছিল। সঙ্গে বরফ কিংবা সোডা। অনসূয়া কিন্তু একটিমাত্র ছোট পেগ নিয়েই বসেছিলেন। কিছুক্ষণ গল্প চলল, কিন্তু ভদ্রমহিলা একবারও বুঝতে দিলেন না এটা ওঁর বাপের বাড়ি না শ্বশুরবাড়ি। এ-বাড়িতে আর কে কে আছেন। ওঁর সিঁথি ধপধপে সাদা, কোথাও বিন্দুমাত্র লাল গুঁড়ো নেই। এক হাতে ভারী একটা সোনার বালা। অন্য হাতে গোলাপি ঘড়ি। চোখাচোখি হলেই আমি বাড়তি কিছু খুঁজছিলাম ওর চোখের মধ্যে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এমন কিছু পাইনি যাতে ওকে ছিটগ্রস্ত বলে মনে হয়।

অনসূয়া হঠাৎ কথার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি অত্যন্ত যুক্তিবাদী মানুষ। সব কিছুই যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। কিন্তু এখন আমার ওই ধারণাটা ভেঙে গিয়েছে। অলৌকিক ঘটনাকে এখন আর আমার পক্ষে অবিশ্বাস করা সম্ভব নয়।'

নন্দন সায় দিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছেন। আপনার সঙ্গে আমি একমত। অনেক কিছু অলৌকিক বলে চালাবার চেষ্টা হয়, সেগুলো সব ঠিক নয়। তবে এটাও ঠিক, যুক্তিবুদ্ধির বাইরেও কিছু-কিছু ঘটে থাকে। আমার কথা হল, তেমন কিছু পেলে অবিশ্বাস করার তো কোনও দরকার নেই। বিজ্ঞান সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারে না। পারা সম্ভবও নয়।'

অনসূয়া মৃদু হেসে বললেন, 'অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে লেখা আপনার রিপোর্টগুলো আমি পড়েছি, পড়তে বেশ লাগে। তবে ওগুলো কিন্তু তখন আমি একেবারেই বিশ্বাস করিনি।'

নন্দনও হাসল। 'এখন বিশ্বাস করছেন?'

ভদ্রমহিলা কোনও উত্তর দিলেন না।

আমার উত্তেজনা বোধহয় বেড়ে গিয়েছিল আবার। বললাম, 'আচ্ছা, আপনি কি ডাইনি বিশ্বাস করেন?'

অনসূয়া অবাক হয়ে বললেন, 'ডাইনি!'

'হ্যাঁ, ডাইনি মানে ডাইনি। গল্পে যেমন পড়া যায়, সেইরকম মন্ত্র-জানা ডাইনি কি এখন থাকা সম্ভব?'

নন্দন আমার হাঁটুতে হাঁটু দিয়ে একটা ধাক্কা মেরে আমাকে থামিয়ে দিয়ে কথা ঘোরাল অন্য দিকে। 'আপনি তো আসল গল্পেই এলেন না এখনও। কী হল আপনার রেসকোর্সের পাশের রাস্তার ভূতের? টেলিফোনে বলছিলেন আপনি এই বিষয়ে অনেকটা এগিয়েছেন। কী সেটা?'

অনসূয়া থমথমে মুখে বললেন, 'বলছি।'

কিন্তু উনি কথা শুরু করার আগেই ভেতরের ঘর থেকে পুরনো দিনের পোশাক-পরা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। চুল আঁচড়াবার ভঙ্গিটাও আদ্যিকালের। হঠাৎ দেখলে মনে হয় কোনও ফ্যান্সি ড্রেসের প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে যাচ্ছেন। নিরীহ, গোবেচারা চেহারা; গায়ের রং আশ্চর্য রকমের ফ্যাকাশে-সাদা। ওঁর দিকে চোখ পড়তেই অনসূয়া চমকে উঠে বললেন, 'ওমা! আপনি এতক্ষণ ভেতরের ঘরে ছিলেন! আমি ভেবেছিলাম, আপনি চলে গেছেন। দিব্যি আমাদের আড্ডা জমে উঠেছে। বসুন আপনি।'

দুদিকে মাথা নাড়তে-নাড়তে ভাঙা-ভাঙা গলায় ভদ্রলোক বললেন, 'আর সময় নেই। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।'

'ঠিক আছে, এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই তাহলে।' আলাপ করানো মানে শুধুই নাম বলা। ওইটুকু শেষ হতে না হতেই কেটে পড়লেন ভদ্রলোক।

কেটে পড়ায় আমি বেশ স্বস্তি পেলাম। এই ধরনের বিদ্ঘুটে একটা লোক আড্ডায় বসলে সে আড্ডা মাটি হতে বাধ্য।

নন্দন আগের কথার জের টেনে বলল, 'ভদ্রলোকের নাম কী যেন বললেন?'

গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে জবাব দিলেন অনসূয়া, 'অবিনাশ দত্ত। এক সময় এঁদের রংয়ের মস্ত ব্যবসা ছিল।'

'এখন?'

'এখনকার খবর জানি না—।'

খাপছাড়া গোছের উত্তর। একটু থতমত খেয়ে নন্দন জিজ্ঞেস করল, 'ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনাদের কি ব্যবসাসূত্রে পরিচয়?'

'না।' ছোট্ট এই শব্দটা ওই প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর হতে পারে না। কিন্তু অনসূয়া ও নিয়ে আর মুখই খুললেন না।

আমার মনে হল, এটা বোধহয় এই বড় বাড়ির কেতা। অধিকারের বাইরে কোনও প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া হয় না। কিংবা...। কিন্তু না, ভদ্রমহিলার চোখের দৃষ্টির মধ্যে তো কোনওরকম অস্বাভাবিকতা নেই।

নন্দন বড় একটা চুমুকে আধখানা গ্লাস প্রায় শেষ করে দিয়ে বলল, 'আপনি আপনার ট্যাক্সিতে চেপে রাত দুটোর সময় রেসকোর্সের পাশের রাস্তায় গিয়েছিলেন, তারপর?'

সরাসরি প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিলেন অনসূয়া। 'গেলাম। গাড়ি চালাচ্ছিল শিবু। পেছনের সিটে আমি। একচক্কর মারা হল, ভোঁ-ভাঁ, কোথাও কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নেই। আমি বললাম, শিবু। শিবু বলল, দিদি, আর একবার ঘুরব? বললাম, ঠিক আছে ঘোরো। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের পাশ দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল শিবু। এবার একটা গা-ছমছমে কাণ্ড ঘটল। রেসকোর্সের ঠিক পাশের রাস্তায় আসতেই মনে হল, কে যেন আমার পাশে বসে আমাকে ঠেলে বাইরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে।'

গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলাম আমি। এক মুহূর্ত থেমে থাকার পরে আবার মুখ খুলল অনসূয়া। 'আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তবে এটাও বুঝেছিলাম, আরও ভয় পেলে প্রাণ নিয়ে আর ফিরতে হবে না। এটা মনে হতেই চেঁচিয়ে উঠে বলেছিলাম: কী হচ্ছে কী? ওই চিৎকারে কাজ হল। যে অশরীরী আমাকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, থমকে গেল সে। আমার ওই চিৎকারে শিবু ঠকঠক করে কেঁপে উঠেছিল। কাঁপতে কাঁপতে গাড়ি চালালে যা হয়, তাই হয়েছিল— গাড়ি একবার ডানদিকের রাস্তায়, একবার বাঁদিকের রাস্তায়। কপাল ভাল যে অ্যাকসিডেন্ট হয়নি। আমি চেঁচিয়ে উঠে বললাম, শিবু গাড়ি থামাও। কোনওমতে এক ধারে গাড়ি থামিয়ে দিয়ে শিবু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।'

আমি এক চুমুকে অনেকটা তরল পদার্থ গলার মধ্যে ঢেলে দিলাম, কিন্তু জল তেষ্টার মতো একটা তেষ্টা বুক আর গলার ভেতরে রয়েই গেল।

নন্দন সিগারেট ধরাবার জন্যে বেশ কয়েকটা কাঠি নষ্ট করল, কিন্তু আগুন জ্বলল না।

খাটো ধুতি, হাফ শার্ট-পরা কাজের লোকদের কেউ এখন ঘরে নেই। অনসূয়া কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন। মাঝ রাত। রেসকোর্সের পাশের নির্জন রাস্তার ধারে আমি। ড্রাইভার সিটের ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। অবাক কাণ্ড, ওই রাস্তায় একটা গাড়িও চলছিল না তখন। বুঝতে পারলাম, ভূতের উপদ্রবের কথা মুখে মুখে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। নিজের ওপর রাগও হল আমার। বলিহারি শখ। এই ধরনের বিদ্‌ঘুটে খেয়াল আর আত্মহত্যা— একই ব্যাপার। রাগ হলে বুঝি দুঃসাহস বেড়ে ওঠে। আমারও তাই হয়েছিল। ওই নির্জন, কুয়াশাঘেরা মাঝরাতে আমি হঠাৎই নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে বলে উঠলাম: আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে আর আমার ড্রাইভারকে মেরে ফেলতে পারেন। তবে মরার আগে বলে যাব, আপনি যা করেছেন তা কোনও ভদ্রলোক বা ভদ্র আত্মা করে না। কী হল তারপর, বলুন তো?'

'কী?'

'কিচ্ছু না। তবে এটা টের পাচ্ছিলাম, অশরীরী কে যেন আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। কোনও ঘটনা না ঘটায় আমি সাহসে ভর করে বলে বসলাম: আপনি যদি আমাদের

কোনও ক্ষতি করতে না চান, তাহলে একটু সাহায্য করুন। ড্রাইভারকে পেছনের সিটে এনে দিন, আমি ট্যাক্সি চালিয়ে বাড়ি ফিরে যাব। মুখ থেকে কথাটা খসামাত্তর দেখি শিবু সামনের সিট থেকে পেছনে। আমি স্টিয়ারিংয়ে বসলাম। তারপর বাড়ি ফিরে এলাম শেষ রাতে।'

নন্দন একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, 'যাক, হ্যাপি এন্ডিং।'

অনসূয়া রায় গম্ভীর মুখে বললেন, 'না, ভোর রাতে ঘরে ঢোকার সময় টের পেলাম, প্রেতাত্মাটি আমার সঙ্গ ছাড়েনি।'

আমার গলা অসম্ভব শুকিয়ে গিয়েছিল, জল খাওয়ার ভঙ্গিতে ঢক-ঢক করে সোডা ওয়াটার খেয়ে ফেললাম অনেকটা।

পুরনো দিনের বসার ঘরের সিলিং থেকে মস্ত এক ঝাড়লণ্ঠন নেমে এসেছে, তবে ওই লণ্ঠনের আড়ালে আছে বিদ্যুতের ঝাপসা আলো। কাচের লণ্ঠনের ঝাড়ের ওপর সেই আলো ঠিকরে পড়েছিল। কার্পেট-মোড়া মেঝের উপর আলো-আঁধারের বিচিত্র নকশা তৈরি হয়েছিল বেশ কয়েকটা। গোড়ার দিকে ঘরের এই মৃদু আলো বেশ লাগছিল, কিন্তু এখন আর ভাল লাগছে না। এর বদলে ঘরের টিউবলাইটগুলো জ্বেলে দিলে ভাল হত!

অদৃশ্য সেই কাজের লোকগুলোকে দেখা গেল আবার। দুজনের হাতের ট্রেতে স্প্রিং চিকেন, সসেজ আর লম্বা করে কাটা আলুভাজা। সাদা একটা প্লেটে টুথ্পিক। আমরা ওই টুথপিকে গেঁথে কিছু স্ন্যাক্স নিলাম। তৃতীয় কাজের লোকটা আমাদের গ্লাসে ড্রিংক্স ঢালল। অনসূয়া সেই আগের জায়গাতেই। আধপেগ হুইস্কির গ্লাসে বরফের টুকরোগুলো গলে গিয়ে গ্লাস টইটম্বুর। সার্ভিস দেওয়ার পরে কাজের লোকগুলো আবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

গ্লাস যাতে চলকে না পড়ে তার জন্যেই বুঝি গ্লাসে বড়সড় একটা চুমুক দিলেন অনসূয়া রায়। তারপর বললেন, 'আমি লালবাজারেও গিয়েছিলাম।'

'লালবাজারে!'

'হ্যাঁ, কেসহিস্ট্রি জানার জন্যে। তা খবর নিয়ে জানলাম, ঠিকই। আজ থেকে ঠিক পঁয়ত্রিশ বছর আগে রেসকোর্সের পাশের রাস্তার ওই জায়গাটায় রাত দুটোর সময় খুন হয়েছিলেন ট্যাক্সির এক যাত্রী। ভদ্রলোক হাওড়া স্টেশন থেকে আসছিলেন। ট্রেন লেট করেছিল, সেইজন্যেই অত রাত। জনাতিনেক ছিনতাই পার্টি যাত্রী সেজে ওই ট্যাক্সিতে উঠেছিল— শেয়ার ট্যাক্সি। তারপর নির্জন ওই রাস্তায় ভদ্রলোকের টাকাপয়সা ছিনতাই করে মারধর দিয়ে ধাক্কা মেরে চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছিল। মাথায় চোট লেগে ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। পুলিশ-পেট্রল পরে ওই বডি দেখতে পায়। ওঁর পকেটের কাগজপত্র থেকে ওঁর পরিচয় জানা যায়। পুলিশ নিজস্ব সোর্স থেকে যে খবর জোগাড় করেছিল তাতে ব্যাপারটা এইরকমই। তবে অপরাধীদের কেউ ধরা পড়েনি। আমি যে খবর পেয়েছি পুলিশ-রিপোর্টের সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল, সুতরাং ওঁকে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।'

'কাকে অবিশ্বাস করার কারণ নেই?'

নন্দনের কথার জবাব দিলেন না ভদ্রমহিলা। ওঁকে কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

গম্ভীর মুখে নন্দন গ্লাসে একটা চুমুক দিল, তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরে! ন'টা বাজে প্রায়। এবার উঠতে হবে। আমি তো অনেক দূরে থাকি।'

ভদ্রমহিলা ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, 'টেবিলে খাবার দিতে বলি তাহলে?'

'অসম্ভব! তখন থেকে শুধু খেয়েই যাচ্ছি। আর কত খাব!'

'বিশেষ কিছুই করিনি। এই শুধু বিরিয়ানি আর মাংস। এখানেই তাহলে খাবারটা নিয়ে আসতে বলি। খেতে খেতে গল্প করা যাবে।'

নন্দন বেয়াড়া কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই আমি বলে ফেললাম, 'সেই ভাল।'

কাজের লোকরা আড়ালে থাকলেও তাদের একটা কান বোধহয় এই ঘরের দিকে ছিল। একটু বাদেই সুগন্ধী বিরিয়ানি আর কষা মাংস এসে গেল। খাবারের চেহারা আর ঘ্রাণ মনে ধরলে শরীরের মধ্যে বুঝি মৃদু একটা আলোড়ন তৈরি হয়। চমৎকার বিরিয়ানি। এদিকে মোগলাই, ওদিকে স্কটল্যান্ডের পানীয়। আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে বেশ একটা ফুর্তির ভাব এসে গিয়েছিল। একটু বেশি কথা বলছিলাম আমরা, কখনও-কখনও একসঙ্গে।

নন্দন হঠাৎ একসময় হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রমহিলাকে বলল, 'আমাদের কাগজের সম্পাদক রেসকোর্সের পাশের রাস্তার ভূতকে নিয়ে রক্ত হিম-করা একটা রিপোর্ট লিখতে বলেছেন। কাহিনীর শুরুটা জব্বর ছিল, কিন্তু শেষের দিকে—। আসলে ভূতটা ভাল না হয়ে ভিলেন হলে খবরটা বেশ জমে যেত!'

উত্তরে অনসূয়া রায় ঝাঁজালো গলায় বলে উঠলেন, 'চটকদার একটা রিপোর্ট লেখার স্বার্থে ভালকে মন্দ বানানো অন্যায়। ইনি ভাল প্রেতাত্মা। বছরে এই একটা সময়, ওঁর মৃত্যুর মাসে, একটু উপদ্রব করতেন। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার পরে কথা দিয়েছেন— এবার থেকে তাও আর করবেন না। আসলে ভূত বলুন আর মানুষ বলুন, সবাই ভালবাসার কাঙাল। ভাল ব্যবহার পেলে, ভালবাসা পেলে, কেউ বখে যায় না। অবিনাশ দত্তের সঙ্গে আপনাদের আলাপ হল। খারাপ লেগেছে ওঁকে।'

'কোন অবিনাশ দত্ত?'

বহুক্ষণ বাদে ছোট পেগ্‌টা শেষ করলেন অনসূয়া। তারপর একটা বড় পেগ ঢেলে নিয়ে বরফের টুকরো মেশাতে মেশাতে বললেন, 'একটু আগেই তো আলাপ হল—। এককালে রংয়ের ব্যবসা করতেন। পরশু রাতে ওঁর মুখে যা শুনেছি, গতকাল পুলিশের পুরনো খাতায় হুবহু সেই রিপোর্ট দেখলাম।

'কিন্তু উনি এসব জানলেন কী করে?'

গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে অনসূয়া বললেন, 'উনি জানবেন না তো কে জানবে! পঁয়ত্রিশ বছর আগে ট্যাক্সি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে যাকে মারা হয়েছিল, উনিই তো সেই রংয়ের ব্যবসায়ী অবিনাশ দত্ত।'

আমি আর একবার বিচ্ছিরিভাবে বিষম খেলাম। নন্দনের হাতের গ্লাস থেকে কিছুটা পানীয় চলকে গিয়ে কার্পেটে পড়ল।

অনসূয়া রায় খসখসে গলায় বললেন, 'বেশিক্ষণ মানুষের চেহারা ধরে থাকতে অবিনাশবাবুর বেশ কষ্ট হয়। আমি বলেছি— আপনি যেমন হাওয়া হয়ে আছেন, তেমনই থাকবেন। মনে হয়, অশরীরী অবস্থায় উনি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলে আপনারা

ভয় পাবেন বলেই .পুরনো চেহারাটা ধরেছিলেন—।'

নন্দন আর আমি দুজনেই হাতের গ্লাসে বড় করে দুটো চুমুক দিয়েছিলাম।

পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখচোখের ঘাম মুছে নিয়ে গলা পরিষ্কার করে নন্দন বলল, 'তা ঠিক, আমি কোনও অশরীরীকে মানুষের চেহারা ধরতে দেখিনি কখনও; কিন্তু শুনেছি। শুনেছি আগের জন্মের মানুষের চেহারা ধরতে ওঁদের বেশ কষ্ট হয়। কিন্তু আপনি যদি কাইন্ডলি—।'

অনসূয়া চোখেমুখে প্রশ্ন ফুটিয়ে তুলে নন্দনের দিকে তাকালেন।

'আপনি জাস্ট একবার, এক মিনিটের জন্য ওঁকে আবার আগের চেহারাটা ধরতে বলবেন—।'

নন্দনের কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত্‌ করে উঠেছিল।

আমি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি না, বরং যারা করে থাকে তাদের নিয়ে একটু ঠাট্টাই করে থাকি। কিন্তু আচমকা ঘরের পরিবেশ এমন হয়ে উঠেছিল যে, আমি দ্রুত চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম একবার।

ভদ্রমহিলা কী যেন ভাবলেন, তারপর দুদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, 'না সেটা সম্ভব নয়। আমি কাউকে কষ্ট দিতে চাই না।'

'এক মিনিট না হোক, আধ মিনিটের জন্যে—।'

'উহুঁ।'

'আপনি আমাদের হয়ে একটু বলেই দেখুন না।'

'কেন বলব বলুন তো?' গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছিল একটু বুঝি অসন্তুষ্ট হয়েছেন অনসূয়া।

'আসলে এমন সুযোগ আমরা মনে হয় জীবনে আর দ্বিতীয়বার পাব না, তাই—।' নন্দন সোম এখন যেন পেশাদার এবং নাছোড়বান্দা সাংবাদিক।

ভদ্রমহিলা একটু অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে বললেন, 'আপনাদের কাছে যেটা নেহাতই কৌতূহল, ওঁর কাছে সেটা অন্যরকম। মানুষের চেহারা আবার ওঁকে ধরতে হলে অসম্ভব কষ্টের মধ্যে পড়বেন, বিশেষ করে একটু আগেই উনি যখন ওই চেহারাটা ধরেছিলেন—।'

কথার ফাঁক খুঁজে পেয়ে সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝানু সাংবাদিক নন্দন। 'বেশ কাল তাহলে আমরা আবার এখানে আসছি। ওঁর সঙ্গে দেখা করে দু-একটা কথা বলেই চলে যাব। 'দু-মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। প্লিজ—।'

অনসূয়াকে একটু বিব্রত দেখাচ্ছিল। 'ঠিক আছে। আমি অনুরোধ করব একবার। তবে উনি রাজি না হলে আমার কিছু করার নেই।'

নন্দন বলল, 'আপনি অনুরোধ করলে উনি ফেলতে পারবেন না।'

'সে ওঁর ব্যাপার। আমি বলব, অনুরোধটা এসেছে আপনাদের তরফ থেকে।'

'না-না, ওরকম ভাবে পাশ কাটিয়ে যাবেন না। আমাদের হয়ে আপনিও একটু বলবেন।'

'সে আমি পারব না। কারণ উনিই বলেছেন মানুষের চেহারা ধরতে ওঁর বেশ কষ্ট হয়।'

নন্দন এবার লোভ দেখানোর গলায় বলল, 'আমি খবরের কাগজের লোক। ওঁকে নিয়ে বেশ বড় একটা কভারেজ দেব। লিখব, উনি খুব ভাল প্রেতাত্মা। মানুষের কষ্ট বোঝেন।'

অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠেছিল অনসূয়ার ঠোঁটে। 'ইহলোক সম্পর্কে ওঁর আর কোনও আগ্রহ নেই। আর পরলোকে আপনাদের খবরের কাগজ পৌঁছয় না।'

'ইহলোক সম্পর্কে আগ্রহ না থাকলে রেসকোর্সের পাশের রাস্তায় মাঝরাত্তিরে উনি উৎপাত করতেন কেন?'

'সে তো বছরে একটামাত্র সময়। তাও আর করবেন না। আমাকে কথা দিয়েছেন।'

'আপনাকে কথা দিয়েছেন যখন, আপনাকে পছন্দ করেন নিশ্চয়ই। সেই জন্যেই বলছি, আমাদের হয়ে একটু বলুন—। দু-এক মিনিটের ব্যাপার তো। দুটো কথা বলব। তারপরেই চলে যাব। আপনার বা ওঁর কারুরই সময় নষ্ট করব না। কথা দিচ্ছি। প্লিজ—।'

ভদ্রমহিলার চোখমুখ দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, উনি খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন। নিরুপায় গলায় বললেন, 'ঠিক আছে বলব, তবে শেষ পর্যন্ত কথা রাখা না-রাখা ওঁর ব্যাপার।'

'কী ভাবে জানব?'

'কাল একবার বিকেলের দিকে ফোন করবেন।'

কথা আদায় করে নন্দন বলল, 'ঠিক আছে আজ তাহলে চলি। খুব ভাল কাটল আজকের সন্ধেটা। নমস্কার।'

বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম আমরা। আমার মাথা বেশ ঝিমঝিম করছিল। পরিস্থিতি হঠাৎ বেয়াড়া হয়ে পড়ার দরুণ একটু বেশিই বোধহয় ড্রিংক করে ফেলেছি।

নন্দন সিটের ওপর বসে মাথা এলিয়ে দিয়েছিল পেছন দিকে। আমিও একটু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছি। চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে হু-হু করে হাওয়া আসছিল। ওই হাওয়ায় নেশা বোধহয় নতুন করে জমে উঠতে শুরু করেছিল।

নন্দন হঠাৎ টান হয়ে বসে বলে উঠল, 'ভদ্রমহিলাকে ছিটগ্রস্ত বলে মনে হয়েছিল প্রথমে। এখন মনে হচ্ছে—।'

আমি সজাগ হয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী?'

'কী বুঝতে পারছিস না?'

আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারিনি। আর একবার প্রশ্ন করলাম, 'কী?'

'এক নম্বরের চিট।'

'কেন?'

'কীরকম একটা গল্প বানাল দেখলি না। ওই ভূতের নামটা কী বলল যেন?'

'অবিনাশ দত্ত।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, রঙের কারবারি ছিল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ঘটনাটা লালবাজারে গিয়ে আবার ভেরিফাই করে এসেছে মহিলা।'

নড়েচড়ে বসলাম আমি। 'তোর তো পুলিশ-মহলে খুব দহরম-মহরম। খবরটা ঠিক কিনা একবার খোঁজ নিয়ে দেখ না।'

'নিয়ে কী করব?'

'ঠিক কিনা দেখবি।'

হঠাৎই হা-হা করে হেসে উঠল নন্দন। 'এতকাল ধরে সাংবাদিকতা করছি— কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আর কখনও হয়নি। মহিলার উদ্দেশ্যটা কী বল্ তো?'

সব গুলিয়ে যাচ্ছিল আমার। চোখের পাতা ভারীও হয়ে উঠছিল। 'কী উদ্দেশ্য?'

'সেটাই তো পরিষ্কার ধরতে পারছি না। যা করেছে, তা তো জালিয়াতিকেও হার মানায়। জলজ্যান্ত ভূত দেখিয়ে দিল।'

আমি এবার সোজা হয়ে বসে বললাম, 'তুই কি ঘটনাটা একেবারেই বিশ্বাস করিসনি?'

'একটা বাচ্চা ছেলেও করবে না।'

'তাহলে তুই কাল আবার ভূত দেখার জন্য বায়না ধরলি কেন?'

'এত বড় একটা সুযোগ ছেড়ে দেব!'

নানা ধরনের অলৌকিক ঘটনার ওপর নন্দনের অগাধ আস্থা। যুক্তি-বুদ্ধি-বিজ্ঞান নাকি ওইসব ঘটনার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারে না। কিন্তু এখন ও ঠিক কী বলতে চাইছে!

আমার নেশা বোধহয় একটু কেটে গেছে। বললাম, 'কিসের সুযোগ?'

নন্দন অদ্ভুত ভঙ্গিতে একটু হেসে নেওয়ার পরে বলল, 'আমাদের সম্পাদক সঙ্গে ফোটোগ্রাফার নিয়ে যেতে বলেছিলেন। এখন মনে হচ্ছে, ঠিকই বলেছিলেন। যা বাজার পড়েছে এখন ভূতের ছবিও তোলা যায়। কাল আমি নিয়ে যাব। প্রথম সুযোগেই ভূতের ছবি তোলাব!'

আমি একটু আমতা-আমতা করে বললাম, 'কিন্তু ভদ্রমহিলা ওঁকে যদি রাজি করাতে না পারেন?'

'ওঁকে মানে কাকে? ওই ভূতকে?' নন্দন বিচ্ছিরিভাবে হেসে উঠল। হাসির দমকে ওর গোটা শরীর দুলছিল। অনেক কষ্টে সেই হাসি থামাবার পরে বলল, 'আমি অলৌকিক ঘটনা, তন্ত্রেমন্ত্রে না হয় কিছুটা বিশ্বাস করি। কিন্তু তুই তো, যাকে বলে যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, তুইও বিশ্বাস করে ফেলেছিস যে, সত্যি সত্যি ভূত দেখেছিস। বললাম না, ও মহিলা অসম্ভব ধুরন্ধর। ও আজ আমাদের ভূত দেখিয়েছে, কাল ওকে আমরা দেখাব।'

'কী করবি তুই?'

'ভূত দেখতে যাব। তারপর ওই ভূত আর ভূতের মালকিন দুটোকেই তোলাব।'

নন্দনের ধাঁধা ধাঁধাই থেকে গিয়েছিল আমার কাছে। মাথাটা আবার ঝিমঝিম করতে শুরু করে দিয়েছে।

নন্দন বলল, 'কাল সকালেই আমি পরমেশদাকে ফোন করছি। বলব, একটা ব্যবস্থা নিন। শুধু ভূত আর ভূতের মালকিন নয়, দলে আরও অনেকে আছে। সবকটাকে তুলুন। আমি সন্ধেয় বেরুবার আগে আবার আপনাকে ফোন করব—।'

নন্দনের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি। জিজ্ঞেস করলাম, 'পরমেশদা কে?'

"পরমেশ সেনগুপ্ত। ক্যালকাটা পুলিশের ডিসিডিডি ওয়ান। ওই মহিলা অ্যান্ড আদার্স মস্ত একটা জোচ্চোরের দল। সব ক'টাকেই ধরাব।"

নন্দনের বুদ্ধির ধার দেখে আমি চমৎকৃত। আমতা-আমতা করে বললাম, 'কিন্তু বড়-

বড় শিল্পপতিদের ছেড়ে দিয়ে মহিলা তোকে ধরল কেন?'

এই উত্তরও নন্দনের কাছে স্পষ্ট। রহস্যভেদীর ভঙ্গিতে বলল, 'খবরের কাগজের লোকদের জন্য শিল্পপতি থেকে রাষ্ট্রপতি— সবার দরজাই খোলা থাকে। আমি ওর মতলবটা এবার পরিষ্কার ধরে ফেলেছি। মহিলা আমাকে ওদের কনট্যাক্ট-ম্যান বানাতে চায়।'

নন্দনের ওপর বরাবরই আমার অগাধ আস্থা। কিন্তু ও যে এতখানি ভূয়োদর্শী— এর আগে আর কখনও টের পাইনি!

নন্দন আমাকে আমাদের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'কাল তোর অফিসের পরেই আমাদের অফিসে চলে আসিস। সন্ধেবেলায় আমরা একসঙ্গে ভূত-পেতনি ধরতে যাব।'

।। পাঁচ ।।

সকালে একটু বেলা করে উঠেছি। যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। কাল সত্যি ছোটলোকের মতো খেয়েছি। একটা গ্লাস তো একবার এক চুমুকেই মেরে দিয়েছিলাম। আসলে ভদ্রমহিলা এমন এক রোমহর্ষক কাহিনী শুনিয়েছিল যে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল আমার।

মাথা ধরা ছাড়াবার ট্যাবলেট খেয়ে পর-পর দু কাপ চা খাওয়ার পরে শরীর কিছু বশে এল। কিন্তু অফিসে গিয়ে কাজে মন বসাতে পারছিলাম না। বারবার কাল সন্ধেয় শোনা বিচিত্র ওই কাহিনীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ওই অবিনাশ দত্তের চেহারাটাও চোখের সামনে ভেসে উঠছিল বারবার। কী অসম্ভব ফ্যাকাশে গায়ের রং। পরনের পোশাক আশাক, চুল আঁচড়াবার ভঙ্গিও আদ্যিকালের। ওই নাকি প্রেতাত্মা! আমরা যাতে ভয় না পাই তার জন্যে মানুষের চেহারা ধরেছিল।

দিনের আলোয় ওই গল্প এখন হাস্যকর। কিন্তু কাল ভদ্রমহিলা অদ্ভুত একটা পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছিলেন। তার উপর ছিল আবার স্কচের প্রভাব।

আমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু নন্দনের গুণগ্রাহী বরাবরই। এখন, এই মুহূর্তে ধরতে গেলে ওর ভক্তই হয়ে গিয়েছিলাম। পুরো ব্যাপারটাকে ও দারুণ বিশ্লেষণ করেছে। শুধু তাই নয়, প্রতারকের দলটাকে হাতেনাতে ধরার পরিকল্পনাও পাকা করে ফেলেছে। আমি আজ সন্ধেয় আবার এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখার জন্য তৈরি হয়ে গেলাম।

অফিসের কাজে মন বসাতে পারলাম না একেবারেই। দুপুরে টিফিন আওয়ার্স শেষ হতে না হতেই ছুটলাম নন্দনের অফিসে। ওকে পেয়েও গেলাম।

দুপুরে ওদের অফিসে আজকেও লোকজন কম। আমাকে দেখেই বলল, 'আয় বোস।'

সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসার পরে নন্দন বলল, 'মহিলা অত্যন্ত ধুরন্ধর। মনে হয় আমার মতলবটা ধরে ফেলেছে।'

'কী করে বুঝলি?'

'আজ সকালে ফোন করেছিল।'

'তোকে?'

'হ্যাঁ। সাত-সকালেই।'

'কী বলল ফোনে?'

নন্দন হেসে উঠল। 'আর এক গপ্পো।'

'কী?'

'বলল, আপনার অনুরোধের কথা অবিনাশবাবুকে আর জানাতে হয়নি। উনি সব শুনেছেন।'

'শুনেছেন! মানে?'

'হ্যাঁ আমিও সেই প্রশ্ন করেছিলাম। তখন ওই গপ্পো ফাঁদল।'

'কী গপ্পো?'

'বলল, হাওয়ায় মিশে উনি তখন ওই ঘরেই ছিলেন।'

কথাটা শুনেই আমার গা ছমছম করে উঠল।

'তারপর?'

নন্দনের চোয়াল একটু কঠিন হয়ে উঠেছিল। বলল, 'বললাম, অ! উনি তখন ঘরে ছিলেন, তাহলে তো আপনাকে কিছুই আর বলতে হয়নি। বলল, না। আপনারা চলে যাওয়ার পরেই উনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। জিজ্ঞেস করলাম— কী বললেন? জাঁহাবাজ মহিলা জবাব দিল— উনি আপনাদের সামনে মানুষের চেহারা আর ধরবেন না, এমনকী হাওয়ায় মিশে থেকেও কথা বলবেন না।'

'অ্যাঁ! তাই? তুই কী বললি?'

'আরও একবার রাজি করাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মহিলার এক কথা— এ ব্যাপারে আমার আর কিছুই করার নেই।'

'তারপরেই কি লাইন কেটে দিল?'

'কাটার তাল করছিল। আমি কাটতে দিইনি। আবেদন করার গলায় বললাম— দেখুন, এ ব্যাপারে আমি তো আপনার কাছে যাইনি। আপনিই এসেছিলেন। আমাদের পত্রিকার সম্পাদক আমাকে অফিসিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন। এখন খবরটা আমি যদি লিখতে না পারি, আমার লস অব ফেস হবে। বুঝতেই তো পারছেন চাকরি করি। আপনি আমার কথা ভেবে প্রেতাত্মাকে একবার রাজি করান। আমি কথা দিচ্ছি— এক মিনিটের বেশি সময় নেব না।'

সারা শরীর আমার উত্তেজনায় টান-টান হয়ে উঠেছিল। 'কী বলল তার উত্তরে?'

'মেয়ে ঘুঘু। পরিষ্কার বলল— আমাকে মাফ করবেন। এ ব্যাপারে কিছুই আমার করার নেই।'

'বলেই রিসিভার নামিয়ে রেখেছিল?'

'না-না। আমি নামাতে দিইনি। উলটো একটা চাপ দিলাম তখন। বললাম, আমাদের সম্পাদকের নির্দেশ তো আমাকে মানতেই হবে। এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে, তাই নিয়েই আমাকে তাহলে রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। আপনার টেলিফোনের এই কথাগুলোও রিপোর্টে রাখব।'

নন্দনের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কী বলল তখন?'

'অদ্ভুত একটা কথা। বলল, উনি অসম্ভব প্রচারবিমুখ আত্মা। উনি এই কাজেও রাজি হবেন না। আমি হেসে বলেছিলাম, কারও রাজি বা গররাজি হওয়ার ব্যাপার তো আর থাকছে না। লিখব আমি, এবং সম্পাদকের নির্দেশে আমাদের কাগজে তা ছাপা হবে।'

সায় দিয়ে আমি বললাম, 'ঠিকই বলেছিস। কী বলল তার উত্তরে?'

'আরও অদ্ভুত একটা কথা। বলল, চেষ্টা করে দেখতে পারেন, তবে মনে হয় পারবেন না।'

'তার মানে?'

'মানে একটাই। কোনও সোর্স ধরেই আমাদের সম্পাদককে বোধহয় ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করবে। সম্পাদক যদি আমাকে বলেন, লিখবেন না, আমি আর লিখতে পারব না।'

আমি একটু আহত হয়ে বললাম, 'সত্যিই তেমন যদি হয়!'

নন্দন আমার আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমাদের সম্পাদক প্রতিদিন এই ধরনের ফোন পান কমপক্ষে গোটা কুড়ি। ফোন পেলেই ওঁর প্রতিক্রিয়া হল: যা লিখছিলেন, আরও বড় করে লিখুন। তেমন বুঝলে উনি খবরটা কাগজের প্রথম পাতাতেও ছাপার নির্দেশ দিতে পারেন।'

শুনে আমি আশ্বস্ত হলাম।

নন্দনদের চা-ওয়ালা ছেলেটা এসে গিয়েছিল। আমাদের সামনে দু-কাপ চা রেখে গেল।

নন্দন চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'আমি আছি বেশ। ভূত নিয়ে ফোন পাওয়ার পরেই ডাইনি ফোন করেছিল আমাকে।'

'কোন ডাইনি?'

'তারকেশ্বরের সেই ডাইনি। বারবার অনুরোধ করে বলল, সামনের রোববার একবার আসুন। আমি প্রথমে রাজি হইনি। শেষে বললাম— যাব, তবে পুরো সময়টা আমাকেই দিতে হবে। রুগি দেখা কি অন্য ভিজিটরদের অ্যালাও করা চলবে না।'

'ডাইনির সেই মন্ত্র-পড়া ঝাঁটার কথা তুলেছিলি?'

'না, তবে মাথায় আছে। গিয়ে বলব।'

বেশ হাসি পেয়ে গিয়েছিল আমার। বললাম, 'তুই সত্যি এসব বিশ্বাস করিস?'

নন্দন গম্ভীর মুখে বলল, 'করি। পৃথিবীতে নানা ধরনের অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ঘটে। তবে এ লাইনে প্রচুর ভেজালও আছে, লোকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার ফায়দা লোটে। এই যেমন অনসূয়া রায়। নামটা অবশ্য সত্যি কিনা কে জানে!'

আমার টিফিনের সময় ফুরোবার মুখে বললাম, 'উঠি তাহলে। তুই কী করবি এখন?'

'হাতে কয়েকটা রুটিন কাজ আছে। সেগুলো সেরেই অনসূয়া রায়ের ভূতের গপ্পো লিখব। সম্পাদক সন্ধের মধ্যে ওটা দিতে বলেছেন।'

আমি উৎসাহী হয়ে বললাম, 'লেখা হয়ে গেলেই দিয়ে দিস না। আমি অফিসের পরে আবার আসছি তোর কাছে। আমি পড়ার পরেই দিবি।'

হাসতে-হাসতে নন্দন বলেছিল, 'ঠিক আছে, চলে আয়। বেশি দেরি করিস না কিন্তু।'

টিফিনের পর অফিসে ফিরে আরও ছটফটে হয়ে গিয়েছিলাম। অদ্ভুত ব্যাপার। অনসূয়া রায় খামোখা এরকম একটা গল্প ফাঁদল! আমার অভিজ্ঞতার পুঁজি খুবই কম। নন্দন যা

বলেছে সেটা হয়তো ঠিকই। মস্ত কোনও মতলব নিয়ে মহিলা বোধহয় ঘুরছে। একা নয়, সঙ্গে আরও অনেকে আছে। কিন্তু মহিলাকে আমি পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারছিলাম না। হয়তো মানসিক কোনও অসুখে ভুগছে। ওই ধরনের কোনও অসুখে ভুগলে চোখের সামনে ভূত-পেত্নি— সবই দেখা সম্ভব। নন্দন একটু বোধহয় বাড়িয়ে ভাবছে। আর যাই হোক, ওই মহিলার পক্ষে চোর-জোচ্চোর হওয়া সম্ভব নয়।

একটুখানি চিন্তাভাবনা করার পরে নন্দনের সিদ্ধান্তকে চটজলদি সিদ্ধান্ত বলে মনে হল। বারবার মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন মস্ত একটা ভুল থেকে যাচ্ছে।

অফিস শেষ হতেই আবার ছুটলাম নন্দনের অফিসে। সন্ধে সাতটার পরে নন্দনের অফিসে ভিড় বাড়ে, খবরের কাগজের কাজের চাপ শুরু হয় তখন। এখন সন্ধে ছটা—। দেখলাম, আমার হিসেবে কোনও ভুল নেই। গোটা অফিসে মাত্র কয়েকজন। কিন্তু নন্দন কোথায়?

খোঁজখবর নেওয়ার একটু পরে দেখলাম, নন্দন কোণের দিকের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু ওর চোখমুখ অসম্ভব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রে, তোর ভূতের খবর লেখা হয়েছে?'

নন্দন আমার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে ওর জলের গ্লাসের ঢাকনা সরিয়ে এক গ্লাস জল চোঁ-চোঁ করে মেরে দিয়ে শূন্য গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে দিল ঠক করে।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কী হল! কথা বলছিস না কেন? তোর কী শরীর খারাপ লাগছে?'

নন্দন এবারও কোনও উত্তর দিল না। ধপ্ করে ওর চেয়ারে বসে পড়ে আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল।

নন্দনের এরকম চেহারা আমি আগে কখনও দেখিনি। আমার উদ্বেগের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। 'তুই কি অসুস্থ বোধ করছিস?'

নন্দন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'বাড়ি যাব, চল।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েছিলাম।

বেরিয়ে এসে নন্দন 'প্রেস' লেখা অফিসের গাড়িতে উঠে পড়ল। ও যে রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছে— এ ব্যাপারে আমার আর কোনও সন্দেহ নেই। ড্রাইভার মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন?'

নন্দন যেন কোনওমতে বলল, 'বাড়িতে।'

আমার উদ্বেগের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছিল। বললাম, 'কাছেই একটা ক্লিনিক আছে, ওখান থেকে ঘুরে যাবি একবার? এই সময় বেশ কয়েকজন ডাক্তারকে পাওয়া যায় ওখানে।'

নন্দন আমার কথার উত্তর মুখে না দিয়ে দুদিকে মাথা নাড়াল।

ওর কোনও কঠিন অসুখের কথা আমার জানা নেই।' কিন্তু হঠাৎ যে অসুস্থ হয়ে পড়েছে— সে ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কী ধরনের অসুস্থতা! বুকে কি ব্যথা করছে? নিশ্বাসের কষ্ট? একটার পর একটা প্রশ্ন জমা হচ্ছিল আমার মধ্যে। কিন্তু আমি কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।

রাস্তা ফাঁকা ছিল, মিনিট-কুড়ির মধ্যেই ওর বাড়িতে পৌঁছে গেলাম আমরা। গাড়ি তক্ষুনি-তক্ষুনি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছিল না আমার। বললাম, 'গাড়িটা কি কিছুক্ষণ রেখে দিবি?'

নন্দন ঠিক আগের ভঙ্গিতেই দুদিকে মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিল।

আমি আর কিছুই বলতে পারলাম না। গাড়ি আমাদের নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

নন্দন আমাকে ওদের বসার ঘরে বসিয়ে রেখে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল। ফিরে এল মিনিট-দশেক বাদে। ওর চোখমুখ আর চুল দেখে বুঝলাম— ভাল করে হাতমুখ ধুয়ে এসেছে। হয়তো মিনিট পাঁচ-সাতেক চিৎপাত হয়ে শুয়ে বিশ্রামও নিয়েছে।

ও আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাজের লোক দু-কাপ কালো কফি দিয়ে গেল। নন্দন আমাকে কফি খাওয়ার কথা না বলে কফির একটা কাপ টেনে নিয়ে পর-পর কয়েকটা চুমুক মারল। এখন ওকে আগের তুলনায় কিছুটা স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর বউ নেই বাড়িতে?'

ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিল ও, 'কিছু বোধহয় কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে।'

নন্দনের মেয়ে ক্লাস টেনে পড়ে। ওর মেয়ের খোঁজ নেওয়ায় বলল, 'টিউশানি নিতে গেছে।'

'বাড়িতে তাহলে তুই ছাড়া আর কেউ নেই?'

'আছে, কাজের লোক।'

'তুই কি এখন আগের চাইতে একটু ভাল বোধ করছিস?'

নন্দন হাসার চেষ্টা করে বলল, 'আমি তো ভালই আছি, কোনও অসুবিধে নেই। তুই কফি খা।'

আমি কফির কাপটা তুলে নিলাম। মাথার ওপরে ফুল স্পিডে পাখা ঘুরছিল। ওই শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনও শব্দ নেই।

কফি শেষ হওয়ার পরে আরও মিনিট-পাঁচেক কেটে যাওয়ার পরে নন্দন ম্লান হাসি হেসে বলল, 'এবার বোঝা যাচ্ছে, বয়েস হয়েছে। টানা দু-বছর একদিনও ছুটি নিইনি অফিস থেকে। আমাদের সম্পাদক একটু বকাবকি করে বললেন— একটা মাস আর অফিসমুখো হবেন না তো। সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। পারলে কয়েকটা দিন ভাল কোনও জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসুন। তারপর অফিসে ফিরে আগের মতো রাজনৈতিক সংবাদদাতা হয়ে যান। ওইসব ছাইভস্ম নিয়ে আর লিখবেন না।'

'ছাইভস্ম নিয়ে লিখবেন না মানে?'

একটু বিব্রত মুখে হাসার চেষ্টা করে নন্দন বলল, 'আমাদের সম্পাদকের কথা বলার ওটাই ধরন। আগে তো আমি শুধুই রাজনীতি নিয়ে লিখতাম, তারপর বছর তিনেক ধরে বেশির ভাগ লেখালেখিই করতাম শুধু অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে। বলা যেতে পারে, এক ধরনের স্পেশালাইজেশনও এসে গিয়েছিল আমার। মজা করে ওটাকেই উনি এখন ছাইভস্ম বলছেন।'

'তুই কী বললি?'

'আমি বললাম, ঠিক আছে। সম্পাদক খুব মুডি লোক। বললেন, আপনার ওই তারকেশ্বরের ডাইনিকে নিয়ে একটা লাইনও লিখবেন না। ওসব গাঁজাখুরি খবর আমি

আর ছাপব না। সাধারণ পাঠকের কথা একবার ভাববার চেষ্টা করুন। আপনি নিজেই তো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সত্যি, কী হয়েছিল তোর বল্ তো?'

নন্দন আর একবার বিব্রত হয়ে বলল, 'না-না, তেমন কিছু নয়।'

আমি চেপে ধরলাম ওকে। 'অসুস্থ হওয়ার ব্যাপারটাকে হেলাফেলা করিস না। অসুখ হ'লে তার ট্রিটমেন্ট হওয়া দরকার। কী হয়েছিল তোর? কিছু গোপন করবি না। আমি তোর ছেলেবেলার বন্ধু—।'

নন্দন ম্লান মুখে আর একবার হাসার চেষ্টা করে বলল, 'টিফিন আওয়ার্সের পর তুই তো ফিরে গেলি তোর অফিসে। আমার কয়েকটা রুটিন-জব ছিল, সেগুলো সারার পরে ঠিক করলাম অনসূয়া রায়ের ওই ভূতের গপ্পোটা লিখে ফেলি—।'

'হ্যাঁ, তুই তো তখনই বলছিলি আমাকে।'

মাথার ওপরে ফুল স্পিডে পাখা ঘুরছে, কিন্তু নন্দনের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিল। ও পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখমুখের ঘাম মুছে নিয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, 'ভদ্রমহিলা বলেছিলেন অবিনাশ দত্ত প্রচারবিমুখ আত্মা। খবরের কাগজের প্রচার চান না। কথাটা মনে হয় ঠিকই। যদি অবশ্য এই ব্যাপারটাকে আমরা সত্যি বলে ধরে নিই—। তবে সত্যি ভাবার কোনও কারণ নেই।'

উত্তেজনায় টান-টান হয়ে উঠেছিল আমার সারা শরীর। কোনও মতে যেন জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'কী হয়েছিল?'

নন্দন বুঝি দম নেওয়ার জন্য থেমেছিল। একটু বাদে বলল, 'আমাদের ফ্লোরের ডান দিকের ঘর দুটো অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরদের। ওঁদের লেখালেখির কাজ সাধারণত চারটে সাড়ে-চারটের মধ্যে হয়ে যায়। আজ বোধহয় একটু আগেই হয়ে গিয়েছিল। তো, আমি ভাবলাম, ওদিকের একটা ফাঁকা ঘরে বসে অনসূয়া রায়ের ভূতের খবরটা লিখে ফেলি।'

'লিখেছিস?'

'লিখতেই তো গিয়েছিলাম—।'

'তারপর?'

নন্দন আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ করে গেল। বুঝতে পারলাম, খুব দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে ওর। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে একটু স্বাভাবিক হয়ে বলল, 'খবর লিখতে গিয়ে অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার।'

'কীরকম?'

'যতবারই লিখতে যাচ্ছি ততবারই মনে হচ্ছিল, কে যেন আমার হাতটা ঠেলে বাঁ দিকে সরিয়ে দিচ্ছে—।'

একটু আগেই কফি খেয়েছি, কিন্তু মনে হচ্ছিল— আমার গলার ভেতরটা অসম্ভব শুকিয়ে গেছে। ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর?'

'প্রথমে মনে হয়েছিল, চেয়ার-টেবিলের পায়ার কোনও গোলমাল হয়েছে। সেই জন্যেই লিখতে গিয়ে হাত নড়ে যাচ্ছে। কিন্তু চেপেচুপে দেখলাম— না, চেয়ার-টেবিলের কোনও দোষ নেই। তাহলে? এবার বেশ সতর্ক হয়ে লিখতে গেলাম, কিন্তু পরিষ্কার মনে হল,

কে যেন আমার হাত ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। একবার ভাবলাম, রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি, সেই জন্যেই বুঝি—। কিন্তু কই, শরীরের কোথাও কোনও অসুবিধে নেই তো! একটু আগে পর্যন্ত অন্য ধরনের কাজ করেছি অনেকক্ষণ। তবে? এর পরে যা শুরু হল তাকে বোধহয় লড়াই বলা যেতে পারে। যতবারই লিখতে যাচ্ছিলাম ততবারই মনে হচ্ছিল— কে যেন জোর করে ঠেলে আমার হাত সরিয়ে দিচ্ছে। তারপরেই অনসূয়া রায়ের টেলিফোনের ওই কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল।'

'কোন্ কথাগুলো?'

'তোকে বলেছিলাম না তখন—। টেলিফোনে আমি ভদ্রমহিলাকে বলেছিলাম— যতটা যা দেখেছি শুনেছি, তাই লিখব। তার উত্তরে ভদ্রমহিলা বলেছিলেন— চেষ্টা করে দেখতে পারেন, তবে মনে হয় পারবেন না। অদ্ভুত ওই কথাগুলো মনে পড়ার জন্যই কি না— আমি হঠাৎ কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সম্পাদক তখন ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কাচের ঘর তো, বাইরে থেকে সব দেখা যায়। উনি এসে আমাকে সামলালেন। ডাক্তারকে কল্ দিতে যাচ্ছিলেন। আমি অতি কষ্টে থামালাম। তারপর সম্পাদকের জেরার মুখে পড়ে আমার ভূত আর ডাইনির কাহিনী ফাঁস হয়ে যায়। উনি তখন আমাকে একটু ধমক দিয়ে বললেন— এসব নিয়ে জীবনে আর একটা লাইনও লিখবেন না। আগে যেমন রাজনীতির খবর লিখতেন, এবার থেকে সেইরকমই লিখবেন। রাজনীতির মধ্যেও ভূত-পেতনি-ডাইনি আছে, ইচ্ছে হলে সেগুলো খুঁজে বার করতে পারেন; কিন্তু সত্যি-সত্যি ভূত-প্রেতের মধ্যে যাবেন না আর।'

আমার চোখেমুখে স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। বললাম, 'খুব ভাল হয়েছে। অলৌকিক-মার্কা ব্যাপারের মধ্যে না যাওয়াই ভাল।'

মৃদু প্রতিবাদের গলায় নন্দন বলল, 'এভাবে বলছিস কেন? তোর কি মনে হয় অলৌকিক বলে কিছু নেই?'

আমি জানি নন্দনের এটা খুব প্রিয় তর্কের বিষয়। কিন্তু তর্কে না ঢুকে আমি পালটা প্রশ্ন করলাম, 'তোর কি মনে হয়, অলৌকিক বলে কিছু আছে?'

নন্দন উত্তর দিতে গিয়েও থমকে গেল।

আমাদের মাথার ওপরে বনবন করে পাখা ঘোরার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ ছিল না। পাখার হাওয়া ছড়িয়ে পড়ছিল সারা ঘরে। হঠাৎ মনে হল, এই হাওয়ার মধ্যে অন্য কোনও হাওয়া মিশে আমাদের কথার দিকে কান রেখেছে।

নন্দনেরও বোধহয় তাই মনে হচ্ছিল। না হলে এমন একটা প্রশ্নের উত্তরে ও কখনওই চুপ করে থাকত না।

সুবিচার

এ পাড়াটা কলকাতার খুব পুরনো পাড়াগুলোর একটা। বেশিরভাগ বাড়িতেই তিন-চার পুরুষের বাসিন্দা। সাবেক কালের ছড়ানো-ছেটানো বাড়ি। বাড়ি হয়তো পাঁচ কাঠা জমির ওপর, কিন্তু ঘরের সংখ্যা সাত-আটটার বেশি নয়। মধ্যিখানে মস্ত উঠোন। একটা সদর আর একটা খিড়কি পথ। বাড়ির সামনে লম্বা রক। সেই রকে সময় ভাগ করে আড্ডা মারতে বসে ছেলেছোকরা আর বুড়োর দল। পুরনো দিনের বহু রীতিনীতি এ পাড়ায় অটুট। একতলা, দোতলা বাড়ির সংখ্যাই বেশি, গুটিকয়েক মাত্র তিনতলা বাড়ি আছে। একটাও হাই-রাইজ নেই। প্রোমোটাররা এই পাড়াটা কব্জা করতে পারেনি এখনও।

পাড়ার বাসিন্দাদের পাড়ার ওপর ভীষণ টান। এখানকার কেউ পরীক্ষায় ভাল ফল করলে গর্বে বুক ফুলে ওঠে পাড়ার লোকদের। কারও বাড়িতে কোনও অঘটন ঘটলে দুঃখ পায় সবাই। ইদানীং এই পাড়ার সবচেয়ে বড় অহঙ্কার অধ্যাপক প্রমথেশ আচার্য। বিরাট পণ্ডিত। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দেশে বিদেশে। প্রতি বছরেই মাস তিনেক তিনি বিদেশে থাকেন। বাকি ন'মাসের মধ্যে বিস্তর সাহেব মেম তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে তাঁর বাড়িতে আসে। শুধু বিদেশীই নয়, দেশের বহু গণ্যমান্য মানুষও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ছাত্রছাত্রীর ঝাঁক তো আসেই। পাড়ার লোকরাই সঙ্গে করে নিয়ে এসে অধ্যাপক আচার্যের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। কারণ এই মানুষটি এ পাড়ার গর্ব।

অধ্যাপকের বসার ঘরটা দেখার মতো। পুরনো আমলের মস্ত একটা ঘরে পুরনো দিনের কারুকার্য-করা আসবাবপত্র। বসার চেয়ার, মোড়া অনেকগুলো। একপাশে মস্ত একটা আরামকেদারা। ছাত্ররা এলে অধ্যাপক ওই আরামকেদারায় বসে জ্ঞানের আলো ছড়ান চারদিকে। বিদেশী বা গণ্যমান্য অতিথিরা এলে উনি সোফা বা চেয়ারে বসেন।

এ ঘরে ঢুকলে যে কারও মনে একটা শ্রদ্ধাভক্তির ভাব জেগে উঠবে। ঘরের চারটে দেয়ালেই বইয়ের র‍্যাক। র‍্যাক শুরু হয়েছে মেঝের একটুখানি ওপর থেকে, শেষ হয়েছে সিলিংয়ের সামান্য নীচে। প্রতিটি র‍্যাকই বইপত্তরে ঠাসা। ঘরের একধারে মস্ত এক পড়ার টেবিল। টেবিলের দু-ধারে দুটো কাঠের হাতি ভারী-ভারী কয়েকটা বই ঠেলে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। মধ্যিখানে মেরুন রংয়ের টেবিল-ল্যাম্প। পড়ার টেবিল পড়ার চেয়ার। এই ঘরটি একই সঙ্গে বসার এবং পড়ার ঘর। প্রায় প্রতিদিনই এ-ঘরে বিদ্যার্থী, গবেষক এবং জিজ্ঞাসু

মানুষরা আসেন। মনের অন্ধকার দূর করতে পারে একমাত্র জ্ঞানের আলো। সেই আলোর ঢল নামে এখানে প্রায়ই।

ঘরের মধ্যে তিনটে গন্ধ কেমন যেন পালা করে ঘোরে। প্রথম গন্ধ বইয়ের। দ্বিতীয় গন্ধ কড়া চুরুটের। চুরুট অধ্যাপকের ঠোঁটের ফাঁকে ঝোলে কিংবা আঙুলের খাঁজে দোলে ধরতে গেলে সব সময়ই। তৃতীয় গন্ধ ঝিমঝিমে এক সুগন্ধের। ওই সুগন্ধের টানেই পাঁচজন যুবক এ-বাড়িতে নিয়মিত আসে। ওই পাঁচজনই অধ্যাপক আচার্যর গুণমুগ্ধ ভক্ত। হাঁ করে অধ্যাপকের জ্ঞানগর্ভ কথা শোনে। তারপর আলোকিত হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। পরদিন আবার আসে।

অধ্যাপক আচার্য অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। তিন রকম ডায়েরি দেখে চলাফেরা করেন। এই পাঁচজন ভক্তকে বেশিক্ষণ সময় দিতে পারেন না। ভেতরের আর একটা বড় ঘরে ওঁর গুরুতর পড়াশুনো আর লেখালেখির কাজ চলে।

গণ্যমান্য অতিথিদের তিনি এই ঘরে নিয়ে গিয়েই কথা বলেন। কথা কখনও-কখনও একটানা বহুক্ষণ ধরে চলে। কিন্তু পাঁচ যুবক ভক্তকে তিনি কখনই পুরোপুরি বঞ্চিত করেন না। অল্পস্বল্প কথা চালাবার পরে প্রায়ই বলেন: তোমারা একটু বোসো, আমি হাতের কাজটা সেরে আসতে পারি কি না দেখি। না পারলে কাল-পরশু তো দেখা হচ্ছেই। তোমরা বরং নন্দিনীর সঙ্গে একটু গল্পটল্প করো, চা খাও। আড্ডা মারো। আড্ডা মারা আমি খুব পছন্দ করি। আড্ডার সব চাইতে ভাল দিক কী জানো? নতুন-নতুন প্রশ্ন উঠে আসে আড্ডা থেকে। আর নতুন প্রশ্ন মানেই তার নতুন-নতুন উত্তর। নতুন প্রশ্ন আর নতুন উত্তর সব সময়ই মানুষকে আলোর দিকে ঠেলে দেয়।

কিন্তু অধ্যাপক যা চাইতেন, ওঁর অনুপস্থিতিতে তা ঠিক ঘটত না। অধ্যাপকের একমাত্র সন্তান নন্দিনী পরমাসুন্দরী এবং বিদুষী। বাবার পাঁচ যুবক ভক্তকে আলোর দিকে ঠেলে না দিয়ে নিজের দিকে টেনে আনত। সব আলো বুঝি জড়ো হয়েছিল নন্দিনীর মধ্যে। ওই আলোয় পোড়ার জন্যে পাঁচ যুবকের আচার-আচরণ ক্রমশ পোকার মতো হয়ে উঠছিল।

নন্দিনী প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকত। মিশত একেবারে বন্ধুর মতো। আড্ডায় চা-কফি চানাচুর আর কাজু বাদাম তো ছিলই। মাঝেমধ্যে আসত সিঙ্গাড়া-কচুরি বা চিকেন রোল। বাবার ভারী-ভারী কথার ছিটেফোঁটাও থাকত না মেয়ের গল্পে। এ গল্প মানে গালগল্প, যা শুনলে বা বললে জ্ঞানভাণ্ডার বাড়ে না, কিন্তু সময় কেটে যায় দিব্যি।

নন্দিনী শুধু পরমাসুন্দরীই নয়, কণ্ঠস্বরও মধুর। ওর বাজে কথাও কানে লেগে থাকত পাঁচজনের। নন্দিনী আশ্চর্য এক গন্ধ মাখত গায়ে। কেমন যেন ঝিমধরানো গন্ধ। ওই গন্ধ পাখার হাওয়ার সঙ্গে ঘরের মধ্যেই ঘুরত। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় পাঁচ যুবককেই আচ্ছন্ন করে ফেলত।

নন্দিনী অবিকল ঝর্নার মতো হাসত। ঘরের মধ্যেই সামান্য চলাফেরায় দুকূলছাপানো বর্ষার নদী হয়ে উঠত। পাঁচজনের মধ্যেই তখন কেমন যেন একটা ঘোর তৈরি হত। পাঁচজনের প্রত্যেকেরই তখন আলাদা করে মনে হত— ওর ওপরেই নন্দিনীর একটু টান বেশি।

নন্দিনী খুব অল্প সময়েরই মধ্যেই জেনে গিয়েছিল, এই পাঁচটি ছেলে ওর পণ্ডিত

বাবার ভক্ত সেজে এ-বাড়িতে ঢুকেছে; কিন্তু বাবা নয়, বাবার মেয়েরই ওরা ভক্ত।

অধ্যাপক আচার্য এসব জানতেন না। প্রতিটি পণ্ডিতের মতোই নিজেকে নিয়ে তাঁর একটি ভুল ধারণা ছিল। তিনি ভাবতেন, তাঁর জ্ঞানের কথা শোনার জন্যেই প্রত্যেকে অজ্ঞান হয়ে আছে। এই যে পাঁচটি যুবক রোজ ছুটে আসছে তাঁর বাড়িতে, তা শুধু তাঁর মুখ থেকে উজ্জ্বল কিছু কথা শোনার জন্যে। কিন্তু আসল কারণটি জানত এদিকে নন্দিনী, ওদিকে পাঁচটি যুবক।

কখনও কখনও অধ্যাপকের হাতে একটু বাড়তি সময় থাকত, সেই বাড়তি সময়টুকু তিনি এই পাঁচ যুবককেই দিতে চাইতেন। আরামকেদারায় আধশোওয়া অবস্থায় বসে তিনি গল্পচ্ছলে জ্ঞানবিজ্ঞানের উচ্চ মার্গের গল্প জুড়তেন। শুনতে শুনতে পাঁচ যুবকের মুখ শুকিয়ে যেত। পণ্ডিত ভাবতেন, একাগ্র হয়ে মূল্যবান কথা শুনলে তো চোখমুখের চেহারা এইরকমই হয়।

কিন্তু বাধা কখনও প্রেমিকদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কষ্টের কথা ভুলে গিয়ে পরদিন আবার তারা হাজির হয়। পরদিন পাওয়া যেত নন্দিনীকে। আর নন্দিনী প্রথম সুযোগেই মজা পাওয়ার গলায় বলে উঠতঃ কী, কাল দারুণ জব্দ হয়েছিলে তো!

পুরো ব্যাপারটা এই ভাবেই গড়াতে লাগল। প্রকৃতিও যা করার তাই করল। কিন্তু অধ্যাপক কিছুই জানতে পারলেন না।

পণ্ডিত মানুষরা জ্ঞানচর্চা ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। আচার্যের একমাত্র স্বপ্ন— জীবনের বাকি দিনগুলোও এইভাবেই পড়াশোনার ভেতরে থেকে কাটিয়ে দেওয়া। স্ত্রী মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। মা মরা মেয়ে নন্দিনীই এখন ওর চোখের মণি। কিন্তু মেয়ে যখন, একদিন তো ঠিক পরের ঘরে চলে যাবেই। কিন্তু অধ্যাপক শেষের এই কথাটা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছিলেন। তবে সংসারে থাকলে বিষয়ী মানুষদের এড়িয়ে থাকা যায় না। তাদের কেউ কেউ আবার এগিয়ে এসে কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। এমন একজন বিষয়ী মানুষ হলেন ইনকাম ট্যাক্সের উকিল চিত্ততোষ চক্রবর্তী।

চিত্ততোষ সৎ এবং পরিশ্রমী। অনেক বছর ধরে অধ্যাপক আচার্যের ট্যাক্সের ঝঞ্ঝাট ঝামেলা সামলাচ্ছেন। অধ্যাপকের কিছু বইপত্র দেশ বিদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য। তার থেকে রোজগার বিশাল। পৈতৃক বাড়িটিও বেশ বড়, বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা বাগানও আছে। এ বাড়ি এবং ওই সব টাকা পয়সার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী নন্দিনী। চিত্ততোষের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্পর্ক নিকট বন্ধুর মতো। রিটার্ন জমা দেওয়ার ঝামেলা সেদিন মিটে যাওয়ার পরে চিত্ততোষ বললেন, 'একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না কিন্তু।'

অবাক হয়ে অধ্যাপক জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

'একেবারেই ব্যক্তিগত কথা। আপনার সঙ্গে তো আমার অনেক দিনের সম্পর্ক, মাঝেমধ্যে নিজেদের মধ্যে একটু সুখ-দুঃখের গল্প করা দরকার। আমাদের দুজনেরই তো বয়েস হয়ে গিয়েছে, কর্তব্যকর্ম যত দূর সম্ভব এবার সেরে ফেলা ভাল।'

অধ্যাপক সামান্য উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ট্যাক্সের রিটার্নে কি সব কিছু দেখানো হয়নি?'

'না না, সবই দেখানো হয়েছে। কোথাও কোনও ভুলচুক নেই। রিটার্ন ঠিকমতো জমাও পড়ে গেছে। ও নিয়ে বিন্দুমাত্র দুর্ভাবনা কখনও করতে হয়নি, হবেও না। আমি বলছি কী, আপনার নিজের বাড়ির দিকে এবার একটু আলাদা করে তাকান। আপনার স্ত্রী বেঁচে থাকলে অবশ্য এ নিয়ে আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হত না।'

চিত্ততোষের কথায় অধ্যাপকের পরলোকগত স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল। সুদেষ্ণা চলে গেছে বছর সাতেক। তখন একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন অধ্যাপক আচার্য। কিন্তু মা মরা মেয়ের দিকে তাকিয়ে মন শক্ত করেছিলেন। দুঃখশোক কেউ এড়াতে পারে না পৃথিবীতে। কিন্তু কর্তব্যকর্ম বোধহয় আরও বড়।

আচ্ছন্নভাব কোনওমতে কাটিয়ে নিজের কাজে মন দিয়েছিলেন তিনি। কাজ বলতে পড়াশুনো আর লেখালেখির জগৎ। পণ্ডিতেরা অমূল্য সব রত্ন ছড়িয়ে রেখেছেন বইপত্রের মধ্যে। সেই রত্নের আভায় ব্যক্তিগত শোক ভুলতে পেরেছিলেন অধ্যাপক। আজ হঠাৎ পুরনো একটা ক্ষতের দিকে চিত্ততোষ হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে দেওয়ায় তিনি একটু বিষণ্ণ হলেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে একটু বুঝি ধরা গলায় বললেন, 'সুদেষ্ণা থাকলে সংসারের দিকে আমাকে ফিরেও তাকাতে হত না।'

সমর্থনের গলায় চিত্ততোষ বললেন, 'তা ঠিক, বৌদির সব দিকেই নজর ছিল। নিজের চোখেই দেখেছি তো সব দিক উনি কী ভাবে সামলে রাখতেন—। উনি থাকলে আজ এই বিষয়ে আপনাকে কিছু মনে করিয়ে দেওয়ার দরকারই হত না আমার।'

এবার অধ্যাপকের দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ হল। 'আপনি ঠিক কোন্ বিষয়টির কথা বলছেন বলুন তো?'

'বলছি আপনার মেয়ে নন্দিনীর কথা।'

উদ্বিগ্ন হলেন অধ্যাপক। 'কেন, কী হয়েছে ওর?'

আশ্বস্ত করার গলায় চিত্ততোষ বললেন, 'কী আবার হবে? কিছুই হয়নি, সব কিছুই ঠিকঠাক আছে। নন্দিনীর মতো ভাল মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি। দেখছি তো এইটুকু বয়স থেকে—। অমন সভ্য, বাধ্য, ভদ্র মেয়ে আর হয় না। মেয়ের যেমন রূপ তেমনি গুণ। সেকেণ্ডারি থেকে এম এ পর্যন্ত দুর্দান্ত রেজাল্ট। হবে নাই বা কেন? কার মেয়ে দেখতে হবে তো? কিন্তু এখন তো ওর পড়াশুনো সব শেষ—।'

অধ্যাপক একটা রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে জবাব দিলেন, 'পড়াশুনোর কী আর শেষ আছে। এই দেখুন না, আমি এই বয়েসেও ছাত্রের মতো, পড়াশুনো করছি।'

'না-না, আমি এই পড়াশুনোর কথা বলছি না। হায়ার স্টাডিজের পথ তো সব সময়ই খোলা। কিন্তু মেয়ের দিকে আপনার এবার আলাদা করে নজর দেওয়ার সময় এসেছে কি না বলুন?'

ধাঁধার মধ্যে পড়লেন অধ্যাপক। 'মানে?'

'মেয়ের কত বয়েস হয়েছে এখন?'

ঘরের সিলিংয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দ্রুত হিসেব কষে অধ্যাপক বললেন, 'এই সেপ্টেম্বরে তেইশ কমপ্লিট করে চবিবশে পা দিয়েছে।'

'তবে?'

'তবে কী?'

অনেক ওপর থেকে নীচে পড়ার ভঙ্গিতে চিত্ততোষ বললেন, 'তবে কী বুঝতে পারছেন না! মেয়ের এবার বিয়ে দেওয়ার কথা ভাববেন না?'

একটু লজ্জা পেলেন বইপড়ুয়া মানুষটি। 'ঠিক। আপনি মনে করিয়ে দিয়ে খুব ভাল করেছেন, এ ব্যাপারটা তো আমার মাথাতেই আসেনি।'

ব্যস্তসমস্ত হয়ে ডায়েরিটা টেনে নিয়েছিলেন অধ্যাপক।

কিন্তু কলম খোলার আগেই চাপা ধমকের গলায় চিত্ততোষ বললেন, 'এই কথাটাও মনে রাখার জন্যে আপনি ডায়েরিতে নোট করছেন!'

আর একবার লজ্জা পেয়ে ডায়েরি রেখে দিয়ে অধ্যাপক জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করা যায় বলুন তো?'

'কী আবার করবেন— সুপাত্রের খোঁজ করুন।'

অধ্যাপক অথৈ জলে পড়লেন। 'কোথায় খোঁজ করব?'

চিত্ততোষ এই মানুষটিকে খুব ভাল করে চেনেন, সুতরাং নতুন করে আর অবাক না হয়ে বললেন, 'পাত্র খোঁজার পথগুলো ধরুন। আপনার তো পরিচিতের সংখ্যা বিরাট, তাঁদের বলুন। আমিও খোঁজখবর নেব। না পেলে কাগজে পাত্র চাই কলামে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেওয়া যাবে।'

পাত্র খোঁজার পথ দেখতে পেয়ে একটু বুঝি আশ্বস্ত হলেন অধ্যাপক। তারপরেই সামান্য উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'আমার মেয়ে যে ভাবে মানুষ হয়েছে, ও কি যে কোনও পরিবারে মানিয়ে নিতে পারবে?'

'যে কোনও পরিবারে বিয়ে দেওয়ার তো দরকার নেই। আপনাদের পরিবারের সঙ্গে যে পরিবারের মিল আছে, তেমনি পরিবারেই ওকে দেবেন। এক কাজ করলে হয় না?'

'কী?'

'আপনার এখানে অনেক ইয়ং ছেলে আসে। আপনার ভক্ত সবাই। আমার মনে হয়, এদের ভেতর থেকেই আপনি নন্দিনীর যোগ্য পাত্র পেয়ে যাবেন।

টেবিলে ছোট্ট একটা চড় মেরে অধ্যাপক বললেন, 'বাহ্! আপনি তো চমৎকার একটা পরামর্শ দিয়েছেন। আমার বাড়িতে সত্যিই বেশ কিছু ভাল ছেলে নিয়মিত আসে। আমি তো আমার ঘরের মধ্যেই সুপাত্র পেয়ে যেতে পারি।'

ওঁর পরামর্শ এভাবে মেনে নেওয়ায় চিত্ততোষ খুব খুশি হলেন। চিত্ততোষ বিষয়ী, সংসারের ভাল মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে অনেক বুদ্ধি ধরেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আপনি কিন্তু হঠাৎ কাউকে বেছে নেবেন না। ছেলে মেয়ের বিয়ে বলে কথা— অনেকগুলো দিক দেখার আছে। নন্দিনীর মতো মেয়ের স্বামী এবং আপনার মতো মানুষের জামাই হতে গেলে কয়েকটা দিক কিন্তু খুঁটিয়ে দেখা দরকার। পাত্রের শিক্ষা, উপার্জন, বংশ— এগুলো দেখতে হবে প্রথমেই। আর একটি দিকও অবশ্যই দেখবেন। নন্দিনীকে আমি আমার মেয়ের মতোই ভালবাসি বলেই বলছি— এমন পাত্র বাছবেন, নন্দিনীর সঙ্গে যাকে মানায়। নন্দিনী পরমাসুন্দরী, পাত্রও যেন মানানসই হয়।'

অধ্যাপক আচার্যের ঠোঁটের ফাঁকে সূক্ষ্ম একটি বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল। 'কোষ্ঠী

বিচরের কথা বললেন না তো?'

বাঁকা হাসিটা লক্ষ করেননি চিত্ততোষ। তাই সরল মনেই বললেন, 'বলিনি মানে, আপনি কোষ্ঠী বিচার মানেন না বলেই বলিনি। কোষ্ঠী বিচার করে বিয়ে দেওয়া তো খুব ভাল। এককালে তো এইভাবেই রাজযোটক বাছাই করার চল্ ছিল আমাদের দেশে।'

'এখন কিসের চল্?'

প্রশ্ন শুনে অবাক হলেন চিত্ততোষ।

অধ্যাপক মৃদু হেসে বললেন, 'এখনও হয়নি, তবে চল্ হওয়া উচিত রক্তপরীক্ষার। এটা চালু হলে বহু দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচতে পারে ছেলেমেয়েরা। কিন্তু আমাদের দেশে বিয়ের আগে রক্তপরীক্ষার কথায় বেশির ভাগ ছেলেমেয়ের মা বাবারা বিয়ে ভেঙে দেবেন। কিন্তু কোষ্ঠী পরীক্ষার কথা তুললে এক পায়ে খাড়া। আমাদের দেশের মানুষজন দুটো জিনিসকে খুব ভয় পায়। এক— প্রকৃত শিক্ষা, দুই জ্ঞানের আলো। এই দুটো থাকলে তো আর মনের আনন্দে অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া যায় না। যায় কী?'

কথাগুলো শোনার পরে চিত্ততোষ অধ্যাপক আচার্যের বাঁকা হাসিটি দেখতে পেলেন। অর্থাৎ পণ্ডিত মানুষটি ওর সঙ্গে ঠাট্টা মসকরা জুড়েছেন।

গম্ভীর মুখে চিত্ততোষ বললেন, 'ঠিক আছে, কোষ্ঠী বিচার নয়, রক্ত পরীক্ষা করেই আপনি জামাই আনুন। আমি সাধারণ মানুষ, জ্ঞানগম্যি নেই। আমরা তো আর ধরাবাঁধা রাস্তার বাইরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারি না। তবে একটা কথা, মেয়ের বিয়ের বয়েস হয়েছে। নিজের পড়াশুনোর চাপে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথাটা ভুলে যাবেন না কিন্তু।'

সত্যিকারের হিতৈষী মানুষটিকে অকারণে একটা খোঁচা দিয়ে ফেলে লজ্জা পেলেন অধ্যাপক। বিব্রত মুখে বললেন, 'আমার কথাটা নেহাতই কথার কথা, ওটা আপনি ধরবেন না প্লিজ। মেয়ের বিয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আপনি সত্যিই আমার অশেষ উপকার করেছেন। তবে জানেনই তো, এসব ব্যাপারে আমি কী সাংঘাতিক পরিমাণে আনাড়ি। আমার একার দ্বারা কিছুই হবে না। আপনি ভরসা দিলেই আমি এগোব। দিচ্ছেন তো?'

অধ্যাপক আচার্যর অকপট ভঙ্গির কথাগুলো শুনে খোঁচা খাওয়ার জ্বালা ভুলে গেলেন চিত্ততোষ। নিচু গলায় বললেন, 'আমি সব সময়ই তো আপনার পাশে আছি। অত ঘটা করে ভরসা চাওয়ার কিছু নেই।'

চিত্ততোষের কথা শুনে আশ্বস্ত হলেন অধ্যাপক আচার্য।

আরও কিছুক্ষণ একথা সে কথা বলার পরে উঠে পড়লেন চিত্ততোষ। 'যাই, বাড়ি যাই। এক মক্কেলের আসার কথা আছে বাড়িতে।'

উঠে গিয়ে অধ্যাপক দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন হিতৈষী মানুষটিকে। কিন্তু দরজা থেকে ফিরে এসে উনি আর নিজের চেয়ারে বসতে পারলেন না। মেয়ের বিয়ের বয়েস হয়েছে, কিন্তু বাবা হিসেবে কর্তব্য পালনের কথা উনি বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছেন! এটা ঠিক হয়নি। অনেক আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল।

চুরুট ধরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করে দিলেন জ্ঞানী মানুষটি। মাথার মধ্যে বিস্তর চিন্তাতরঙ্গ ছড়িয়ে যাচ্ছিল একটার পর একটা। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেবেন ঠিকই, কিন্তু ওঁর কাছে সুপাত্রের সংজ্ঞা অন্যরকম। সেই সংজ্ঞার মধ্যে পাত্রের

উপার্জন, বংশপরিচয়, এমনকী চেহারাটেহারাও পড়ে না। তিনি চান সত্যিকারের একজন আদর্শবান ছেলে। যার আদর্শ নেই, তার নীতি নেই। আর যার নীতি নেই, তার কিছুই নেই।

অধ্যাপক চুরুটে ঘন ঘন টান দিচ্ছিলেন, পায়চারি করার গতিও বেশ বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওঁর মনোমতো পাত্র নির্বাচনের সঠিক পথটি উনি কিছুতেই দেখতে পাচ্ছিলেন না। দেখতে না পাওয়ার ফলে ওঁর অস্থিরতা বেড়ে গিয়েছিল।

এই অস্থিরতা থাকার জন্য পড়াশোনায় ঠিক মন বসাতে পারছিলেন না অধ্যাপক। নানা শাখার গুণী মানুষ এবং ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকেও উনি মাঝেমধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। তবে অস্থিরতার শিকার বেশি দিন হয়ে থাকতে হয়নি ওঁকে। সপ্তাহ দেড়েকের মাথায় উনি আদর্শ পাত্র নির্বাচনের মনের মতো একটি পথ খুঁজে পেলেন। পথটি নানা দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করার পর উনি নিশ্চিত হলেন যে, বিবেকবান, আদর্শ পাত্র বাছাই করার এটিই হল সেরা পথ। গভীর কোনও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার শেষ খসড়ায় উনি যেভাবে ডবল টিক মারেন, পাত্র বিচারের অভিনব এই পথটিকেও ঠিক সেইভাবেই টিক মারলেন, তবে মনে মনে।

অধ্যাপকের কণ্ঠস্বরে সুর নেই, কিন্তু মনে আনন্দের মাত্রা খুব বেড়ে গেলে এবং ধারেকাছে কেউ না থাকলে কদাচিৎ উনি গুণগুণ করেন। অভিনব পথটি আবিষ্কারের পরে উনি দু'কলি গাইলেন, তারপর গলা তুলে ডাকলেন, 'নন্দিনী'।

নন্দিনী নিজের ঘরে বুকে বালিশ দিয়ে শুয়ে টিভিতে বিলিতি একটা অ্যাকশন ফিল্‌ম দেখছিল। মাঝপথে উঠে পড়া খুব কঠিন, কিন্তু কী আর করবে, বাবার কথা ও কখনও অমান্য করে না। একটু অনিচ্ছা সহকারেই টিভি বন্ধ করে বাবার স্টাডিতে এসে বলল, 'কী বলছ?'

অধ্যাপক সস্নেহে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই কি এখন ব্যস্ত?'

বাবার মধুর কথা শুনে অ্যাকশন ফিল্‌ম ছেড়ে উঠে আসার দুঃখ ভুলে গিয়ে নন্দিনী বলল, 'না-না। কিছুই করছিলাম না। কী জন্যে ডেকেছ বলো? কালো কফি খাবে একটু?'

হেসে অধ্যাপক বললেন, 'না, এখন আর কফিটফি খাব না। তোর সঙ্গে একটু গল্প করার জন্যে ডেকেছি। দূরে কেন? কাছে আয় না।'

অবাক হল নন্দিনী। পড়ুয়া মানুষটি দিনরাত্তির পড়ে পড়ে আরও পড়ার সময় পায় না বলে আফসোস করে, সে কিনা এখন শুধুই গল্প করার জন্যে ডাকছে।

পায়ে পায়ে কাছে এল নন্দিনী। বাবা ওর গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'তুই যে কবে এত বড় হয়ে গিয়েছিস আমি খেয়ালই করিনি। তোর তো ইউনিভারসিটির পড়াও শেষ। কী করবি এখন ঠিক করেছিস?'

নন্দিনী বলল, 'তোমার তো আমার কথা শোনারই সময় নেই। আমি মাসখানেক হল একটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সে ভর্তি হয়েছি।'

অধ্যাপক মেয়ের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'খুব ভাল করেছিস। তা, কী ভাষা শিখছিস?'

'চীনে ভাষা।'

'চীনে? খুব ভাল করেছিস। এই সব আগে শেখা উচিত। আমদের এখানকার সবাই ছোটে ফরাসি আর জার্মান শেখার জন্যে। হালে অবশ্য স্প্যানিশের দিকেও ঝোঁক পড়েছে। তবে ঘরের পাশেই যে বিদেশ, সেই বিদেশি ভাষা শেখার লোক তেমন নেই। তা, কেমন লাগছে?'

ঝলমলে মুখে উত্তর দিল নন্দিনী, 'খুব ভাল। আসলে চীনে বর্ণমালাগুলো এত সুন্দর দেখতে।'

"ক'দিনের কোর্স?"

'আমি একটা কণ্ডেন্সড্ কোর্সে ভর্তি হয়েছি। ছ মাসের কোর্স।'

'বেশ, তার পর কী করবি?'

আর একবার অবাক হল নন্দিনী। 'ভেবে দেখিনি। আসলে চুপচাপ বসেছিলাম তো, তাই ভাবলাম ভর্তি হয়ে যাই।'

'খুব ভাল কাজ। বাড়তি সময়ের কিছুটা সব সময়ই পড়াশুনোয় দেওয়া উচিত। তা, আমি বলছিলাম কী, আরও তো কাজ আছে— একটা কাজ তো বেশ বড়, সে দিকে এবার নজর দিতে হবে।'

বাবার কথাটা ধাঁধার মতো ঠেকল নন্দিনীর কাছে। 'কী কাজ?'

'উপস্থিত একটাই কাজ। নিজের বাড়িতে যেতে হবে না এবার?'

'নিজের বাড়িতে!'

'এটা তো তোর বাপের বাড়ি।'

নন্দিনী কথার ভেতরের অর্থ বুঝে নিয়ে মাথা নিচু করল।

'তুই এক কাজ কর তো। সামনের রোববার সকাল সাড়ে নটায় তোর পাঁচ বন্ধুকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলে দে তো।'

'কোন পাঁচ বন্ধু!'

'আমার কাছে যে পাঁচটি ছেলে নিয়মিত আসে, ওরা তো তোর এখন বন্ধু হয়ে গেছে। ওদের আসতে বলে দে, একটু কথা আছে ওদের সঙ্গে।'

আর একবার অবাক হল নন্দিনী। ওর মনে বিস্তর প্রশ্ন ভিড় করেছিল, কিন্তু একটাও বার হল না মুখ দিয়ে।

বাবা স্নেহের সঙ্গে মেয়ের পিঠে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'এবার একটু কালো কফি খেতে ইচ্ছে করছে যে—। খাওয়াবি?'

প্রশ্ন করতে না পেরে পালাবার তাল করছিল নন্দিনী। বাবা সেই সুযোগটা করে দিতেই দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল নন্দিনী।

।। দুই ।।

পরদিন সামান্য আগে-পিছে পাঁচটি ছেলেই এসে হাজির হয়েছিল নন্দিনীদের বাড়িতে। বিদেশ থেকে দুজন স্কলার এসেছেন অধ্যাপক আচার্যর কাছে। অধ্যাপক তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন নিজের স্টাডিতে বসে। এসব কথাবার্তা সাধারণত তিন-চার ঘণ্টার আগে শেষ হয় না।

অধ্যাপক ব্যস্ত আছেন শুনে পাঁচটি যুবকই আশ্বস্ত হল মনে মনে। অধ্যাপক তিন-চার ঘণ্টার আগে বেরুতে পারবেন না ওঁর ঘর থেকে, সুতরাং পুরো সময়টাই পাওয়া যাবে নন্দিনীকে।

পাঁচ যুবকই উৎফুল্ল হয়ে কথা শুরু করেছিল এক সঙ্গে।

নন্দিনী ওদের থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমরা এসেছ খুব ভাল হয়েছে, নাহলে তোমাদের পাঁচজনকেই আলাদা আলাদা করে ফোন করতে হত আমাকে।'

'ফোন! কেন?'

'তোমাদের জরুরি তলব হয়েছে। রোববার সকাল সাড়ে-নটার মধ্যে এখানে এসে হাজির হবে।'

'তলব কার?'

'কার আবার হবে! যার সঙ্গে দেখা করার জন্যে তোমরা এখানে আসো। দেখা না পেলে মন খারাপ করে থাকো কিছুক্ষণ, তারপর আমার সঙ্গে আগড়োম-বাগড়োম বকে কিছুটা সময় কাটাও।'

কথাটা বলার পরেই বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল নন্দিনীর চোখে। সেই বিদ্যুতের আলো পাঁচটি যুবকেরই বুকে গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল।

'ইয়ার্কি কোরো না তো। কে ডেকেছে আমাদের?'

'বললাম তো, যার কাছে তোমরা আসো— অধ্যাপক আচার্য। বাবা আমাকে বারবার বলে দিয়েছে— সামনের রোববার সকাল সাড়ে নটার মধ্যে তোমরা যেন অবশ্যই এখানে পৌঁছে যাও।'

'কেন?'

'তা তো আমাকে বলেনি। হয়তো কোনও ব্যক্তিগত কথা বলতে চায়।'

'ব্যক্তিগত কথা।'

'কথার ভঙ্গিতে তাই তো মনে হয়েছিল।'

'পাঁচজনের সঙ্গেই ব্যক্তিগত কথা।'

'অসুবিধেটা কোথায়? পঞ্চ পাণ্ডবকে তো অনেকে আলাদা করে ভাবতে পারত না। বাবার চোখে তোমরা হয়তো পঞ্চ পাণ্ডব।'

কথার শেষে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল রূপসী। হাসলে ওর সর্বাঙ্গ কাঁপে, আর চোখে বিদ্যুৎ ঝলকায়।

নন্দিনীর কথা আর হাসি পাঁচটি যুবককেই বিহ্বল করে দিয়েছিল।

বিহ্বল ওরা নন্দিনীর কথা শুনে প্রতিদিনই হয়। কিন্তু আজকের এই কথাটার সঙ্গে

অন্যান্য দিনের কথার কোনও মিল নেই। তাছাড়া নন্দিনী হঠাৎ পঞ্চ পাণ্ডবের কথা তুলল কেন? পঞ্চ পাণ্ডবের কথা এভাবে বললে তো দ্রৌপদীর কথা মনে পড়ে যায়।

নন্দিনীর কথা বলার ধরনও রহস্যময়। পাঁচজনই বুঝতে পারল, নন্দিনী আসল ব্যাপারটা জানে, কিন্তু বলতে চাইছে না।

পাঁচজন যুবকের বুকের মধ্যে নানা ধরনের বাজনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাজনা ছাপিয়ে বিচ্ছিরি একটা ধুপধুপ শব্দও ওদের কানে বাজছিল। প্রত্যেকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটা প্রশ্নই করল। 'সত্যি বলো না, কী জন্যে আমাদের ডেকেছেন তোমার বাবা?'

উত্তরে নন্দিনী রহস্যের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল আরও অনেকখানি।

'কী জানি, আমাকে কিচ্ছু ভেঙে বলেননি।'

'আভাসে বলেছেন তো। সেটাই বলো।'

'মনে হয় তোমাদের পাঁচজনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়ে আলোচনা করবেন, কিংবা—!'

'কিংবা কী?'

তোমাদের কারও ওপর গুরুতর কোনও দায়িত্ব চাপিয়ে দেবেন।'

'কী ধরনের দায়িত্ব?'

'গুরুতর এটা মনে হচ্ছে, কিন্তু সেটা কী— বুঝতে পারিনি।'

কথাটা বলেই নন্দিনী আবার গলা খুলে হাসল। হাসিতে গালে টোল পড়েছিল ওর। মুক্তোর মতো দাঁতের সারি অবিকল মুক্তোর মতোই ঝিকঝিক করছিল। হাসির সঙ্গে সর্বাঙ্গের কাঁপুনিও বেড়ে গিয়েছিল অনেকখানি।

ওর মাথায় এক রাশ কালো কোঁকড়ানো চুল। শরীরের দুলুনিতে চুলের রাশির কিছুটা ভেঙে পড়ছিল কপালের ওপর। নন্দিনীকে আশ্চর্য এক মোহময়ীর মতো দেখাচ্ছিল।

অবশ হয়ে গিয়েছিল পাঁচ যুবক। একই প্রশ্ন কতবার যে করল— তার আর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তরে নন্দিনীর বুঝি একটাই কাজ ছিল— তা হল রহস্যকে আরও ঘন করে তোলা।

পালা করে পাঁচ যুবকেরই বেশ কয়েকবার নতুন করে মনে হয়েছিল— নন্দিনী ছাড়া জীবন অচল। নন্দিনী নেই মানে কিছুই নেই।

অন্যান্য দিনের মতো নানা ধরনের মজার গল্প জুড়েছিল আগুনের মতো দেখতে নন্দিনী। কিন্তু সে সব গল্পে আগের মতো আর জড়িয়ে পড়তে পারছিল না পাঁচজন যুবক।

গল্পের আড়ালে একটি প্রশ্নই বারবার উঁকি মারছিল পাঁচজনের মনে— কী জন্যে ওদের ডাকা হয়েছে সামনের রোববার?

গল্প গড়িয়েছিল ঘণ্টাতিনেক, কিন্তু একদম গোড়ার দিকে নন্দিনী যা জানিয়েছে তার বাইরে আর পা বাড়ায়নি। গল্পের শেষে টানটান রহস্য নিয়েই পাঁচ যুবক এ বাড়ি ছেড়েছিল এক সময়।

।। তিন ।।

পরের রোববার সকাল ন'টার মধ্যেই পাঁচ যুবক হাজির হয়ে গিয়েছিল অধ্যাপক আচার্যের বাড়িতে। অধ্যাপক কথা-কাজে এক। ওঁর সাড়ে ন'টা মানে ঠিক সাড়ে ন'টাই, এক মিনিট এদিক ওদিক নয়।

পরমাসুন্দরী নন্দিনীকে আজ আগের দিনের চাইতেও ঢের বেশি রহস্যময়ী দেখাচ্ছিল। মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলল, 'আধঘন্টা এবার হাঁ করে বসে থাকো। বাবা সাড়ে ন'টার আগে এ ঘরে ঢুকবে না। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।' কথাটা বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নন্দিনী।

পাঁচ যুবকের মধ্যে সম্পর্কটা বন্ধুত্বের, কিন্তু আজ কেউ কারও সঙ্গে খোলা মনে গল্প করতে পারছিল না। পরস্পরের মধ্যে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে পাঁচজন পাঁচটা চেয়ারে বসে পড়েছিল।

এ ঘরে মুখ লুকোবার বিন্দুমাত্র অসুবিধে নেই। টেবিলের ওপরে একগাদা পত্রপত্রিকা পড়ে আছে । পাঁচজন পাঁচটা পত্রিকা তুলে নিয়ে হঠাৎই বেশ মনোযোগের সঙ্গে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। কাজের লোক চা দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কারও যেন কোনও হুঁশ ছিল না। ধোঁয়া ওঠা চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে।

বাতাসে অল্পস্বল্প শীতের ধার। সকালের রোদ বাদামি হয়ে উঠতে শুরু করেছে সবে। এমন সকালে ধোঁয়া-ওঠা সোনালি চায়ের বাড়তি একটা টান থাকে। কিন্তু উদ্বেগ-উত্তেজনার চাপ বেশি হওয়ায় পত্রিকার পাতায় মুখ আড়াল করে মনে মনে আকাশ পাতাল ভেবে যাচ্ছিল প্রত্যেকেই।

এটা শীতের সকাল না হলে প্রত্যেকের কপালেই বোধ হয় কয়েকটা ঘামের বিন্দু ফুটে উঠত। উদ্বেগ-উত্তেজনা বাড়ালে গলা শুকিয়ে যায় কম বেশি। এদেরও বোধ হয় শুকিয়েছিল।

কেমন যেন পালা করে প্রত্যেকেই কাশছিল— শুকনো কাশি। দেয়ালঘড়িতে সেকেণ্ডের কাঁটা ঘোরার শব্দটা খসখসে গোছের। ওই শব্দটা বোধহয় পাঁচজন যুবকের ওপর অতিরিক্ত একটা চাপও তৈরি করেছিল।

এই যে পাঁচজন যুবক, এবার এদের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। একদম কোণের দিকে বসে আছে সাত্যকি রায়। অত্যন্ত সুপুরুষ। সবে চোখের ডাক্তার হয়েছে। তার পাশে সমরজিৎ মুখার্জি, আই এ এস অ্যালায়েড সার্ভিসে কোয়ালিফাই করেছে। চেহারায় লাজুক ভাবটা বড্ড বেশি। তবে বিচক্ষণ মানুষরা জানেন, আমলার চাকরি কিছুদিন করলেই চোখেমুখে ব্যক্তিত্ব এসে যাবে ঠিক। ওর থেকে একটু দূরে বসে আছে সলিল সামন্ত। চৌকো মুখ, বেশ শক্তসমর্থ চেহারার যুবক। সামনের মাস থেকেই এক্সপোর্টের ব্যবসায় নামছে।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পাশে বেতের চেয়ারে প্রায় ডুবে বসে আছে অবন সোম। বিদেশের কয়েকটা স্টুডিওতে কাজ শিখে কিছুকাল হল দেশে ফিরেছে। ইচ্ছে আছে কয়েকটা ডকুমেন্টারি করে কিছু পয়সা তুলে নিয়ে আর্ট ফিল্মে হাত দেবে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, একটা

আর্ট ফিল্ম বানালেই রাতারাতি ও জগৎজোড়া খ্যাতি পাবে। খ্যাতির হাত ধরে পয়সাও আসবে। তবে অর্থ নিয়ে এই মুহূর্তে ওর কোনও মাথাব্যথা নেই। দরজার একেবারে কাছাকাছি বসে আছে অর্ণব মজুমদার। অতিমাত্রায় শান্তশিষ্ট, ভালমানুষ প্রকৃতির ছেলে। অধ্যাপক আচার্যের অধীনে গবেষণা করে ডক্টরেট হয়েছে সবে। অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট দুর্দান্ত। একটু কপাল আর একটু ধরাধরির জোর থাকলে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর চাকরিও পেয়ে যেতে পারে।

অধ্যাপক আচার্যের গুণমুগ্ধ ভক্তদের প্রথম সারিতে আছে এই পাঁচজন। অধ্যাপক দারুণ জমিয়ে গল্প করতে পারেন। তবে ওঁর গল্প বলার ভঙ্গি আর পাঁচজনের থেকে একেবারেই আলাদা। ওঁর গল্পের মধ্যে কী অবলীলায় গোটা পৃথিবী এসে যায়।

পৃথিবী মানে শুধু আজকের পৃথিবী নয়। মানুষ যখন সবে সভ্য হতে শুরু করেছে— গল্প অনেক সময় সেই জায়গায় শুরু হয়। তারপর হয়তো শেষ হয় আজকের কোনও অসভ্যতার কাহিনীতে এসে। গভীর সব দর্শন আর ইতিহাসের বিচিত্র কথা এমন ভঙ্গিতে বলেন যে, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে।

একটা কথা উনি প্রায়ই বলে থাকেন। বলেন, পুরনো দিনের এত কথা বলছি বলে তোমরা আমাকে আবার প্রাচীনপন্থী ভেবে বোসো না। আমার বিচারে আগের সব ভাল, আর এখনকার সব খারাপ— এমন কিছু ভেবো না। এখনও বেশ কিছু ভাল কাজ হচ্ছে, তবে সুদূর অতীতে এর চেয়ে ঢের বেশি ভাল কাজ হত। অন্য সব কথা ছেড়ে দাও— শিক্ষার পদ্ধতিটা কী দুর্দান্ত ছিল বলো তো। গল্পচ্ছলে শিক্ষা। কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা খারাপ— তা তুমি শুধু গল্প শুনেই শিখে যাচ্ছ। শুধু তাই নয়, কোন্ কাজ কী ভাবে করতে হবে, বিশেষ কোনও কাজে দক্ষ হতে গেলে কী করতে হয়, তাও ওই গল্পের ভেতর দিয়েই বলা। বত্রিশ সিংহাসন, জাতক, পঞ্চতন্ত্র আর কথাসরিৎসাগরের গল্পগুলোর মধ্যে কী না আছে বলো তো! জ্ঞানের একেবারে শীর্ষে চড়তে পারলে সেই জ্ঞানের কথা এত সহজ ভাবে বলা যায়।

কথাগুলো মুগ্ধ হয়ে শুনত পাঁচ ভক্ত, কিন্তু ইদানীং নন্দিনী এসে পড়ায় অধ্যাপকের গল্পের আকর্ষণ ওদের কাছে কমে গেছে। দারুণ সব গল্প, কিন্তু অধ্যাপকের হঠাৎ কোনও জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেলে পাঁচজনেই খুশি হয়। কিংবা চায়, গণ্যমান্য কেউ আচমকা এসে পড়ুক। তেমন কেউ এলে অধ্যাপক তাঁকে নিয়ে ওঁর স্টাডিতে চলে যাবেন। তেমন হলে নন্দিনীকে আলাদা করে পাওয়া যাবে কিছুক্ষণ। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নন্দিনী ওদের নন্দিনী ছাড়া আর সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছিল।

অধ্যাপক আচার্যের মাথায় এক এক সময় এক একটা জিনিস ভর করে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত উনি কেবল নৃতত্ত্বের কথা শোনাতেন। এখন শুধু জাতক, পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদির কথা। ওঁর এখনকার কিছু কিছু জরুরি প্রয়োজনও ওই সব গল্পের মাধ্যমেই উনি বোঝাবার চেষ্টা করতেন মাঝেমধ্যে। গল্পের সাহায্যে বলার জন্যে প্রথমে বিষয়টা একটু হেঁয়ালি গোছের ঠেকত শ্রোতাদের কাছে। কিন্তু জট ছাড়িয়ে আসল অর্থ বার করার পরে সবাই বেশ মজা পেত।

সকাল ঠিক সাড়ে নটার সময় চুরুট ঠোঁটে ঝুলিয়ে দোতলা থেকে একতলার বসার

ঘরে নেমে এলেন অধ্যাপক আচার্য। ওঁর পরনে পাটভাঙা পাজামা-পাঞ্জাবি। ঘরে ঢুকেই বললেন, 'গুডমর্নিং।' উত্তরে 'মর্নিং' বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল অনুরাগী পাঁচ যুবক। হাত তুলে ওঁদের বসতে বলে ইজিচেয়ারটায় বসলেন অধ্যাপক। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা সবাই চা খেয়েছ তো?'

উত্তরে সবাই মাথা নাড়িয়ে দিল একপাশে।

অধ্যাপকের চুরুটে কিছুটা ছাই জমেছিল, উনি চুরুট ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সেই ছাইটা দেখলেন কিন্তু ছাইদানিতে ঝাড়লেন না। তারপর পাঁচজন যুবকের ওপর একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'মোস্ট এলিজিব্‌ল ব্যাচেলর বলতে যা বোঝায় তোমরা ঠিক তাই। যে কোনও বাবা মা তোমাদের যে কারও হাতে তাদের মেয়েকে তুলে দিতে পারলে খুব খুশি হবে। তোমাদের আরও একটা বড় গুণ— তোমরা প্রত্যেকেই খুব অ্যাকমপ্লিশড্‌। মুক্ত মনের মানুষ। সবকিছুই বিচার করে গ্রহণ করার ক্ষমতা তোমাদের আছে। তোমরা আমাকে ভালবাসো, এটা আমার বাড়তি লাভ। তবে আমার চেয়েও ঢের বেশি ভালবাসো আমার মেয়ে নন্দিনীকে, তাই না?'

অধ্যাপকের সঙ্গে এই পাঁচজনের সব ব্যাপারে খুব খোলামেলা কথাবার্তা হয়, কখনও কোনও ব্যাপারে লজ্জা পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এই বিষয়টা এমনই যে, প্রত্যেকেরই মাথা একটু নিচু হয়ে গিয়েছিল। পাঁচজনেই নন্দিনীকে খুব বেশি রকমের পছন্দ করে, আর ওদের এ বাড়িতে আসার প্রধান কারণ এখন ওই নন্দিনীই। অধ্যাপক আচার্য অত্যন্ত পণ্ডিত মানুষ, পণ্ডিতদের এইসব ঘরোয়া ব্যাপারে মাথা খোলে না। উনি যে এই কথাটা এ ভাবে বলে ফেলবেন— সেটা কেউ ভাবতেই পারেনি!

অধ্যাপক চুরুটে ছোট্ট একটা টান মেরে বললেন, 'লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। সব মানুষের জীবনে বসন্তকাল আসে। বসন্তকালে বসন্তেরই হাওয়া বইবে, এটা প্রাকৃতিক বিধান। তোমরা যুবক, আমার মেয়ে তরুণী। তোমরা যদি প্রেমে পড়ে যাও সেটা অঘটন নয়। তবে সমস্যা হল তোমরা পাঁচজন, আর ও একা। এ যুগে ওর পক্ষে তো আর দ্রৌপদী হওয়া সম্ভব নয়। তোমাদের মধ্যে একজনকে ওকে বেছে নিতে হবে। এখানেও একটা সমস্যা আছে। সেই একজনকে ওর পক্ষে এক কথায় হয়তো বেছে নেওয়া কঠিন। তার কারণ তোমরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত যোগ্য পাত্র। আমি তাই ওকে সাহায্য করার কাজে এগিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের ছোট্ট একটা পরীক্ষা নেব। সেই পরীক্ষায় যার ফল সবচেয়ে ভাল হবে, তার হাতেই নন্দিনীকে তুলে দেব আমি। কী, রাজি?'

জবাবে ঘরের পাঁচজনের কেউই কোনও কথা বলতে পারল না, তবে ওদের চোখেমুখে অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল পরিষ্কার।

অধ্যাপক চুরুটের ছাই ফেললেন ছাইদানিতে, তারপর প্রশান্ত মুখে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে এতদিন ধরে আমি এত যে গল্প করেছি, তা তো নিছক আড্ডা নয়। আমাদের গল্পে দেশবিদেশের চিন্তাবিদ্‌দের কত কথা এসেছে। তার থেকে আমরা কি কোনও শিক্ষাই পাইনি? পেয়েছি কি না বলো?'

এবারও কেউ কোনও জবাব দিতে পারল না। ওদের চোখমুখের অস্বস্তির ছাপ আর একটু বোধহয় বেড়েছিল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিলেন অধ্যাপক। 'আমি বলছি, পেয়েছি। শিক্ষার প্রকাশ তো কাজে। আমাদের সামনে তেমন কোনও কঠিন সমস্যা এলে শিক্ষার আলো আমাদের পথ দেখাবেই। এখন যেমন। এই যে আমি যে পরীক্ষাটা নিতে যাচ্ছি, সেটা অনেকটা সেই ধরনের একটা সমস্যা। তোমরা ভয় পেয়ো না, পরীক্ষা দাও, তোমাদের শিক্ষাই তোমাদের পথ দেখাবে।'

এবারও কেউ কোনও উত্তর দিল না। পাঁচজন যে ভাবে বসে ছিল ঠিক সেই ভাবেই বসে থাকল। মুখচোখের স্বাভাবিকতা ফেরেনি। নন্দিনী হুট করে একবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, তারপর ঘরের থমথমে চেহারা দেখেই কেটে পড়েছে।

রোদের রঙ এখনও বাদামি। চমৎকার ওই আলোর খানিকটা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল। এ পাড়াটা কলকাতার পুরনো পাড়াগুলোর একটা। মাঝেমধ্যে তাই ফেরিওলার হাঁক শোনা যাচ্ছিল বাইরে, এছাড়া আর কোথাও কোনও শব্দ নেই।

অধ্যাপক আচার্য চুরুটে লম্বা একটা টান মেরে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন অনেকটা, তারপর বললেন, 'আমার বারবার কী মনে হয় জানো? একটা মানুষ সারা জীবন ধরে শুধু যদি জাতকের গল্পগুলো পড়ে যায়— বেশি গল্প নয়, সাড়ে পাঁচশোর মতো, ছোট মাপের গল্প— তাহলে তার আর কিছু পড়ার দরকার নেই। তার শিক্ষা সম্পূর্ণ। বেঁচে থাকার প্রতি পদে পদে নানান রহস্য আমাদের সামনে এসে পড়ে। কিন্তু তেমন ভাবে জাতক পড়া থাকলে সব রহস্যেরই সমাধান করা সম্ভব। ভারতের প্রাচীনতম গল্প এই জাতককাহিনী। জাতকের গল্পগুলো কবে লেখা হয়েছে বলো তো?'

ঘরের পাঁচজনের চোখমুখ দেখে যে-কারও পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব, জাতকের জন্মকথা শোনার জন্যে কারও বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

কিন্তু অধ্যাপক গল্প করার মেজাজে এসে গিয়েছিলেন, তিনি শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামালেন না। ভরাট গলায় বললেন, 'ধরে নেওয়া যেতে পারে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকেই জাতকের প্রথম সৃষ্টি। কিছু কিছু গল্প বুদ্ধের জন্মের আগে থেকেই চলে আসছে। কিছু বুদ্ধের সময়ের, কিছু তার পরের। শোনা যায়, মহেন্দ্র যখন সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিল জাতকের গল্পগুলো। সেই পুঁথির এখন আর কোনও হদিশ পাওয়া যায় না। সিংহলী ভাষায় যে জাতক প্রচলিত আছে এখনকার জাতককাহিনী তারই অনুবাদ। শুধু সিংহলে নয়, ভারতের এই জাতকের গল্প মধ্যযুগে গোটা ইউরোপে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। আমরা আরব্য উপন্যাস বা দেকামেরন নিয়ে এত যে হৈ-চৈ করি, ওইসব গল্পের আদিতে কী আছে বলো তো? আমাদের এই ভারতের জাতককাহিনী।'

অধ্যাপক আচার্যের তালঠোকা গোছের এই মন্তব্যের কোনও ছাপ পড়ল না শ্রোতাদের চোখেমুখে। বরং ওরা বোধহয় একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক মূল কথা থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন।

চুরুট নিবে গিয়েছিল, অধ্যাপক সেটা ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি অবান্তর কথার মধ্যে যাইনি। তোমাদের যে পরীক্ষাটা নিতে যাচ্ছি, সেই পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতির শিক্ষা পেয়েছি এই জাতক থেকেই। ধরো আমি একজন নিঃসম্বল ব্রাহ্মণ। নিঃসম্বল কিন্তু

শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু যে দক্ষিণা চায় ছাত্ররা প্রাণ দিয়েও সে দক্ষিণা দিয়ে থাকে। একলব্যের কথা তোমাদের মনে আছে তো? গুরুদক্ষিণা দিতে গিয়ে তাকে হাতের বুড়ো আঙুল কেটে দিতে হয়েছিল। ভয় পেয়ো না, আমি অত কঠিন দক্ষিণা চাইব না তোমাদের কাছে। ধরো আমি কপর্দকশূন্য গুরু। আমার বাড়িতে বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। তার বিয়ে ঠিক হল একসময়। এখন তোমাদের কাছে আমার আবেদন, আমার মেয়ের বিয়ের জন্য মূল্যবান কিছু জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে এসো। হ্যাঁ চুরি, দক্ষিণার শর্তই হল চুরি। তোমরা উপার্জনযোগ্য, কিন্তু কেউ এখনও রোজগার শুরু করোনি। সুতরাং আমি ধরে নিচ্ছি তোমাদের নিজস্ব টাকাপয়সা বলে কিচ্ছু নেই। তোমরা সম্পন্ন ঘরের ছেলে, কিন্তু বাড়ি থেকে কিছু চেয়ে আনবে না। গুরুর আদেশ— শুধুমাত্র চুরি করে এমন কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসবে যেগুলো আমার মেয়ের বিয়েতে লাগবে।'

অধ্যাপক আচার্যের কথা শুনে ঘরের পাঁচজনেই অবাক চোখে ওঁর দিকে তাকিয়েছিল। অর্ণব অধ্যাপকের সরাসরি ছাত্র, একটু ইতস্তত করে বলল, 'স্যার, আপনি যা বলছেন সেটা ওই জাতকেরই গল্পের একটা অংশ, তাই তো?'

অধ্যাপক তীক্ষ্ণ চোখে ছাত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন, আমি যা বলছি সেটা কি আজগুবি ঠেকছে?'

খুব অসন্তুষ্ট না হলে অধ্যাপক কখনোই এভাবে কথা বলেন না। ওঁকে ক্ষুব্ধ হতে দেখে ঘরের পাঁচজনেই বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিল। সাত্যকি নিচু গলায় বলল, 'স্যার, আমরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি। আপনি একটু খুলে বলুন, কী করতে হবে আমাদের। যা বলবেন তাই করব। সত্যিই যদি কোনও পরীক্ষা নিতে চান তো নিন। যেভাবে নিতে চান সেই ভাবেই দেব।'

শেষ কথাটা সাত্যকি ঘরের বাকি চারজনের দিকে তাকিয়ে বলেছিল। বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ওকে খোলা গলায় সমর্থন করেছিল: হ্যাঁ-হ্যাঁ বলুন স্যার, কী করতে হবে বলুন। আমরা আজ পর্যন্ত কোনও ব্যাপারে আপনার কথার অবাধ্য হইনি।

ছাত্র কিংবা যারা ছাত্রদের মতো তাদের কাছে মাস্টারমশাইয়ের সবচেয়ে বড় চাওয়া হল আজ্ঞাবহতা। যা বলছি সেটা আগে শোনো। পরের কথা পরে। অথচ পৃথিবীর সব মাস্টারমশাই ছাত্রদের বলে থাকেন— কোনও কিছু অন্ধের মতো মেনে নিও না। যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করবে আগে, তারপর গ্রহণ করার মতো হলে গ্রহণ করবে। এই উপদেশটা মাস্টারমশাইরা কিন্তু নিজেদের বেলায় মানতে চান না। কোনও ছাত্র পাল্টা প্রশ্ন করলে ধরতে গেলে সব গুরুই রেগে যান। তর্ক হচ্ছে? বাঁদর কোথাকার!

যেখানে তা হয় না, ছাত্ররা বাধ্য থাকে, সেখানে মাস্টারমশাইয়ের চেহারাও অন্য ধরনের হয়। অধ্যাপক আচার্য প্রসন্ন মুখে ঘরের পাঁচজনের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'তোমাদের ছাত্রজীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। তোমরা এখন আমার বন্ধুর মতো। সে অর্থে তোমাদের কোনও পরীক্ষা আমি কখনও নিইনি। এই একবারই নিচ্ছি। এই প্রথম এবং শেষ। তোমরা সেই প্রাচীন কালের শিষ্যদের মতো একবার মাত্র গুরুর কাছে পরীক্ষা দাও। পরীক্ষার ধরনটা জাতককাহিনী থেকে নেওয়া। এটাও খুব প্রাচীন। সুতরাং কোথাও কোনও বিরোধ নেই।'

সলিল বলল, 'বলুন স্যার, আপনি যা বলবেন, তাই করব। আপনার কথার কখনও অবাধ্য হইনি আমরা।'

বাইরের বাদামি রোদের মতো ঝলমলে হয়ে উঠেছিল অধ্যাপকের মুখ। ওঁর মুখে কিছুটা গর্ব কিছুটা লজ্জা। একটু থেমে থেমে বললেন, 'সারা জীবনটাই তো আমার ছাত্রদের সঙ্গে কেটে গেল, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী তোমাদের মতো ছাত্র আমি খুব কমই পেয়েছি। তোমাদের নিয়ে আমার চাপা একটা অহংকার আছে। আমি জানি তোমরা দেশের, দশের মুখ উজ্জ্বল করবে। তোমরা রত্নবিশেষ। তোমাদের এখন চুরি করার কথা বললে তোমাদের খারাপ তো লাগবেই।'

অধ্যাপকের কথার উত্তরে পাঁচজনেই প্রায় একসঙ্গে আপত্তি তুলল: না, না, আমাদের কিছু খারাপ লাগছে না।

অবন মিটিমিটি হেসে বলল, 'চুরির কথায় আমার তো বেশ মজা লাগছে স্যার। আমি আগে কখনও চুরি করিনি। এই প্রথম করব, তাও গুরুর আদেশে। আমার জীবনে মহাবিদ্যার হাতেখড়ি বোধহয় এই ভাবেই হচ্ছে, আমি তো আর্টফিল্ম বানাতে যাচ্ছি। এই আর্টফিল্মে শুনেছি পরের সেলুলয়েড না বলে নেওয়ার খুব চল্ আছে। তা ভালই হল, আমার একটা প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে এই সুবাদে।'

অবন মাঝেমধ্যে এই ধরনের ফচকেমো করে থাকে এবং অধ্যাপক আচার্য তাতে একটুআধটু সস্নেহ প্রশ্রয়ও দেন। কিন্তু এখন উনি বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমি যা বলছি তোমরা মন দিয়ে শোনো। যা বলছি কখনোই তার বাইরে যাবে না।'

অধ্যাপকের কথা শুনে ঘরের পাঁচজনের চেহারা অবিকল মনোযোগী ছাত্রের মতো হয়ে উঠেছিল।

চুরুট আবার নিবে গিয়েছিল, ধরিয়ে নিয়ে গলগল করে বেশ কিছুটা ধোঁয়া ছাড়ার পরে অধ্যাপক আচার্য বললেন, 'ধরে নাও আমি প্রাচীন ভারতের গুরু। গুরু, কিন্তু সহায় সম্বল বলতে কিছু নেই। তোমরা আমার প্রিয় ছাত্র। তোমাদের শিক্ষা শেষ। বাড়ি ফিরে যাবে এবার তোমরা। আমার পাওনা বলতে গুরুদক্ষিণা। আমি তোমাদের বললাম— দেখ, আমার মেয়ের বিয়ে দেব এবার, কিন্তু আমি গরিব ব্রাহ্মণ। বিয়ের দরকারি জিনিসপত্র কেনার সঙ্গতি নেই। বিয়েতে লাগবে এমন কিছু দামি জিনিস তোমরা আমাকে দিয়ে যাও। তবে আমি কোনও ভিক্ষার দান গ্রহণ করব না। তোমরা ওইসব জিনিস আমার জন্যে চুরি করে নিয়ে আসবে। চুরি ছাড়া আর কোনও ভাবেই নয়।'

সমরজিৎ বেতের চেয়ারে সামান্য একটু দোল খেয়ে বলে উঠল, 'ব্যাপারটা খুব এক্সাইটিং। অন্য কোনও ভাবে নয়, চুরি করে, শুধুই চুরি—বাহ্!'

অধ্যাপক আচার্যের কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল। গম্ভীর মুখে উনি বললেন, 'একটা ব্যাপারে তোমাদের কিন্তু আমি সাবধান করে দিতে চাই। স্রেফ একটা পরীক্ষা নেওয়ার জন্যে তোমাদের আমি চুরি করতে বলছি। এই চুরির জন্যে তোমরা কিন্তু কখনোই বড় রকমের ঝুঁকি নেবে না। সম্পূর্ণ অচেনা লোকের বাড়ি থেকে চুরি কোরো না। চুরি করার জন্যে আত্মীয়বন্ধুর বাড়ি বেছে নিও। ওইসব জায়গায় ধরা পড়লে আর যাই হোক মারধোর খাওয়ার ভয় থাকবে না। সম্পর্ক হয়তো কিছু দিনের জন্যে খারাপ হবে— এই যা।

এনি কোয়েশ্চেন?'

ঘরের পাঁচজন মাথা নাড়ল দুদিকে, যার অর্থ পুরো ব্যাপারটাই ওদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন নেই। অধ্যাপক আচার্য দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, আমি এখন উঠব। তোমরা তাহলে তোমাদের চুরি করা জিনিসপত্রগুলো নিয়ে সামনের রোববার সাড়ে ন'টা নাগাদ চলে এসো এখানে। তোমরা কি আর এক কাপ চা খাবে?'

'না-না, আর নয়।'

অধ্যাপক ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়েছিল পাঁচজন।

।। চার ।।

পরের রোববার সকাল ন' টার মধ্যেই অধ্যাপক আচার্যর বাড়ি যেন একটু সরগরম হয়ে উঠেছিল। সামান্য আগে পরে চারটে ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছিল বাড়ির সামনে। হাতে বাহারি প্যাকেট নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমেছে পাঁচজনের চারজন। একজন শুধু খালি হাতে বাসে এসেছে। তার নাম অর্ণব।

অধ্যাপকের বসার ঘরে আগের দিনের ভঙ্গিতেই বসেছিল ওরা। কারও সঙ্গে কারও কথা নেই। আড়চোখে তাকিয়ে এ তার, সে ওর হাতের প্যাকেটের ভেতরের জিনিসগুলো আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল। নন্দিনী একবার কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা একরাশ কোঁকড়ানো চুল নাচাতে নাচাতে ঘরে ঢুকে বলে গেল, চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ও চলে গেছে কিন্তু ওর কৌতুকপূর্ণ রহস্যময় দৃষ্টিটা অদ্ভুত উপায়ে পড়ে আছে ঘরের মধ্যে।

ঠিক সাড়ে নটার সময় ওপর থেকে নীচে নামলেন অধ্যাপক। অন্যান্য দিনের মতো আজকেও ওঁর পরনে পাটভাঙা পাজামা আর পাঞ্জাবি। হাতে চুরুট। ঘরে ঢুকে উনি একটু মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, 'গুডমর্নিং'।

ঘরের পাঁচজনও ওই কথাটা বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। অধ্যাপক ওঁর ইজিচেয়ারে বসার সময় ইঙ্গিতে ওদের বসতে বলেছিলেন। অধ্যাপকের গোঁফের ফাঁকে ছোট্ট একটা হাসির রেখা ছড়িয়ে পড়েছিল। উনি বললেন, 'তোমাদের হাতের জিনিসপত্রগুলো দেখেই বুঝতে পারছি মিশন সাকসেসফুল। কিন্তু, কেউ কোনও বিপদের মধ্যে পড়োনি তো?'

ঘরের বিভিন্ন কোনা থেকে উত্তর এসেছিলঃ না-না, একদম নয়, একেবারে পাকা চোরের মতো কাজ সেরেছি।

জবাব শুনে উজ্জ্বল একটা হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল অধ্যাপকের মুখে। হাসতে হাসতেই বললেন, 'তোমরা যদি পাকা চোর হও তাহলে আমি কী? চোরের সর্দার?'

ওঁর কথায় ঘরের পাঁচজন খোলা গলায় হেসে উঠেছিল।

অধ্যাপক বললেন, 'নাও এবার বার করো তোমাদের চোরাই জিনিসপত্র।'

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এ ঘরের ভেতরদিকের দরজার পর্দাটা একটু নড়ে উঠেছিল।

ওই দিকে কেউ যদি তাকায় তাহলে হয়তো দেখতে পাবে পর্দার ঢেউয়ের পাশে নন্দিনীর চোখের মতো দুটো চোখ, তবে এই মুহূর্তে পর্দার দিকে নজর দেওয়ার মতো সময় নেই কারও। যে যার হাতের প্যাকেটগুলো খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক বললেন, 'সব প্যাকেট একসঙ্গে খুলো না। এক এক করে খোলো। এক ধার থেকে। সাত্যকি, তুমিই তোমার প্যাকেটটা আগে খোলো।'

আজ ঘরের বাইরে ঝকঝকে রোদ। রোদের দিকে তাকালেই বোঝা যায় আকাশে এককুচিও মেঘ নেই। ওই রোদের কিছুটা ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাছাড়া আজ ঘরের মধ্যে দুটো নিয়নবাতিও জ্বলছিল।

সাত্যকি রঙিন কাগজের মোড়ক খুলে ফেলতেই বড়সড়, চৌকো একটা কেস বেরিয়ে পড়েছিল। সেটা খুলতেই ঝলমল করে উঠল একটা সোনার হার। বেশ ভারী চেহারা, আর নকশাও দুর্দান্ত। অমন একটা উপহার দেখে ঘরের সবারই বোধহয় কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

একটু পরে কেশে গলা পরিষ্কার করে অধ্যাপক বললেন, 'সাত্যকি, এ তো দেখছি একেবারে নতুন। তুমি এটা দোকান থেকে কিনে আনোনি তো?'

সাধারণ ক্ষেত্রে 'চোর' বললে একজন অপমানিত ভদ্রলোকের চোখমুখের চেহারা যেমন হয়, সাত্যকির চোখমুখ এখন ঠিক সেইরকম। তড়বড় করে বলে উঠল, 'না স্যার, এটা আমার টানা জিনিস। চোরাই মাল বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। গত সপ্তাহেই আমার ভাইঝির বিয়ে হয়েছে— ওখান থেকে হাতিয়েছি।'

হাত তুলে অধ্যাপক ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'থাক-থাক, কোত্থেকে কী ভাবে চুরি করেছ সেটা আমার আর জানার দরকার নেই। সমরজিৎ তুমি কী চুরি করে এনেছ দেখাও।'

সমরজিতের হাতের প্যাকেটটাও খুব বড়। ও লাজুক মুখে প্যাকেট থেকে বার করল একটা সুন্দর কোয়ার্টজ ঘড়ি আর একসেট ওভেন প্রুফ গ্লাসওয়্যার।

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে অধ্যাপক বললেন, 'বাহ্! চুরির মধ্যেও তোমার বেশ একটা রুচিবোধ কাজ করেছে দেখছি। অবন তুমি কী এনেছ?'

অবনের প্যাকেট খোলাই হয়ে গিয়েছিল, ও ভেতর থেকে বার করল মেরুন রঙের একটা সিল্কের শাড়ি। সকলের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল চমৎকার ওই শাড়িটার ওপর। অধ্যাপক বললেন, 'বাহ্! নন্দিনীকে এ শাড়িটায় দারুণ মানাবে!'

লাজুক মুখে বাহবা হজম করে অবন জানাল, 'ক্যামেরাটা আমার সাবজেক্ট স্যার। আমার একটা চোখ থাকে সবসময় কস্টিউমের দিকে। কাকে কী মানাবে তা তো খেয়াল রাখতেই হয়। নন্দিনীর গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা, মেরুন রঙের শাড়িতে ওকে দুর্দান্ত দেখাবে। সেই জন্যেই ওই রঙটা আমি বেছেছি।'

চোখ একটু ওপরের দিকে তুলে অধ্যাপক বললেন, 'চুরির জিনিসে কি বাছাইয়ের সুযোগ থাকে?'

কথাটা এদিকে ঘুরে যাবে ভাবতে পারেনি অবন। আমতা-আমতা করে বলল, 'না, তা ঠিক থাকে না। তবে চুরি করার সময় পাকেচক্রে এই সুযোগটা আমি পেয়ে

গিয়েছিলাম—। ধারে-কাছে কেউ কোথাও ছিল না তখন।'

মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠেছিল অধ্যাপকের মুখে। 'সবই নন্দিনীর কপাল। সলিল তুমি?'

সলিলের প্যাকেটটা সবচেয়ে বড়। ওটা কার্পেটের ওপর নামিয়ে রেখেছিল ও। অধ্যাপকের কথা শুনে ও দ্রুত মস্ত প্যাকেটের দড়ি খুলে ফেলল, তারপর ভেতর থেকে একটা টিন টেনে বার করল।

'কী ওটা?'

ঘরের সবাই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল টিনটা দেখে। বিব্রত মুখে জবাব দিয়েছিল সলিল, 'আমাকে তো প্রায়ই হোলসেলারদের কাছে যেতে হয়, তা ওখান থেকেই সরিয়েছি এটা। এটা খুব চালু একটা বেবি ফুড।'

জবাব শুনে ঘরের প্রায় প্রত্যেকেই বিচ্ছিরি ভাবে হেসে উঠেছিল। ওই হাসির শব্দে মাটিতে মিশে গিয়েছিল সলিল। কোনওমতে বলল, 'চুরি করার আগে তো আর বুঝতে পারিনি ভেতরে কী আছে!'

অধ্যাপকের চোখেমুখে লালচে একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। উনি রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললেন, 'খুবই সত্যি কথা। চুরি করার আগে তুমি কী করে বুঝবে ভেতরে কী আছে। অর্ণব তুমি, তুমি কী চুরি করে এনেছ?'

এই পাঁচজনের মধ্যে শুধু অর্ণবের হাতই খালি ছিল। উপহার খুব দামি হলে পকেটে করেও আনা যায়। সুতরাং সবাই বুঝি ওর দিকে বাড়তি একটা আগ্রহ নিয়ে তাকিয়েছিল।

কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে বসে থাকার পরে উঠে দাঁড়াল অর্ণব। তারপর মাথা নিচু করেই বলল, 'স্যার আমি আপনার ডিরেক্ট ছাত্র। ইউনিভার্সিটিতে আপনার কাছে পড়েছি। আপনার আন্ডারে গবেষণা করে ডক্টরেট পেয়েছি। আপনি যা করতে বলবেন বিনা প্রতিবাদে তা আমার করা উচিত। এতকাল ঠিক তাই করে এসেছি। কোনও ব্যাপারে অবাধ্যতা করিনি। গত রোববার আপনি যখন আমাদের কিছু কিছু জিনিসপত্র চুরি করে আনার আদেশ দিয়েছিলেন তখনও আমি আপত্তি তুলিনি। ভেবেছিলাম, উদ্দেশ্য যদি ভাল হয় তাহলে পথ খারাপ হলেই বা দোষ কী! আপনি বেশ ধনী অধ্যাপক, কিন্তু আপনি আপনাকে নিঃসম্বল গুরু ভাবতে বলেছিলেন, আমি তাই ভেবেছিলাম। কন্যাদায়গ্রস্ত শিক্ষাগুরু মেয়েকে পার করার জন্যে প্রিয় ছাত্রদের কিছু জিনিসপত্র চুরি করে আনতে বলছেন— এর মধ্যে কোনও অন্যায় দেখিনি আমি সেদিন, কিন্তু পরে—!'

রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে অধ্যাপক আচার্য জিজ্ঞেস করলেন, 'পরে, পরে কী দেখলে তুমি এর মধ্যে?'

প্রশ্নের উত্তরে আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ছিল অর্ণব, তারপর মুখ খুলল। 'পরে ভেবে দেখলাম, উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক না কেন, চুরি করা মহাপাপ। আমি এই ব্যাপারে আপনার কথা রাখতে পারলাম না বলে আমাকে মাফ করবেন স্যার। আমি আজ কিছুই চুরি করে নিয়ে আসিনি।'

অর্ণবের কথায় গোটা ঘরের চেহারাটা অদ্ভুত রকমের থমথমে হয়ে উঠেছিল। অধ্যাপকের চোখমুখ থেকে রক্ত যেন ফেটে পড়ছিল। উনি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন,

তারপর ধীর পায়ে এগোতে লাগলেন অর্ণবের দিকে।

অর্ণবের চোখ নীচের দিকে, কিন্তু ঘরের চারজোড়া চোখ অধ্যাপকের ওপর। অধ্যাপক ধীর পায়ে কিছুটা হাঁটার পরে হঠাৎই ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন অর্ণবকে, তারপর বললেন, 'আজকের পরীক্ষায় একমাত্র তুমিই উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমার মতো ছাত্র পেলে যে কোনও শিক্ষকেরই শিক্ষকজীবন ধন্য হবে। তোমাকে নিয়ে আমার গর্বের শেষ নেই। আমার শিক্ষার সারপদার্থটুকু তুমি নিতে পেরেছ। আমি তোমাদের চরিত্র যাচাই করার জন্যে এই ধরনের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। তুমি পাশ করেছ সসম্মানে। চুরি করা সত্যিই মহাপাপ। উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক না, জীবনে কখনই কোনও অবস্থাতেই চুরি করবে না। আমার মেয়ে নন্দিনীর যোগ্য পাত্র হিসেবে তোমাকেই আমি নির্বাচন করলাম। সামনের বিয়ের তারিখেই নন্দিনীর সঙ্গে তোমার আমি বিয়ে দেব।'

কথাটা শেষ হওয়ামাত্রই অর্ণব অধ্যাপকের পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে নিয়েছিল।

অধ্যাপকের চোখমুখ বেশ উজ্জ্বল। অর্ণবকেও বেশ চকচকে দেখাচ্ছিল, কিন্তু ঘরের বাকি চারজনের মুখে একটা কালচে ছোপ ধরে গিয়েছিল হঠাৎ।

অধ্যাপক ক্লাসে লেকচার দেওয়ার ভঙ্গিতে কথা শুরু করলেন ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে। 'আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা কী উঁচু মানের ছিল। সেই মান আমরা ধরে রাখতে পারিনি। বরং যত দিন যাচ্ছে তত নীচের দিকে পড়ে যাচ্ছি। আমাদের কাজ হল এখন এই শিক্ষাব্যবস্থাকে যতটা সম্ভব ফিরিয়ে আনা। এই যে আমি তোমাদের চরিত্র পরীক্ষার যে কৌশলটা নিয়েছিলাম সেটা কিন্তু আমার আবিষ্কার নয়। এটা আমি শিখেছি জাতককাহিনী থেকে। এক সময় বোধিসত্ত্ব বারাণসী নগরে এক ব্রাহ্মণের পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন এক আচার্যের কাছে। মেয়ের বিয়ের জন্য আমি তোমাদের যা করতে বলেছিলাম আচার্যও ঠিক তাই বলেছিলেন। আজ অর্ণব যা বলেছে সেদিন বোধিসত্ত্বও ঠিক তাই বলেছিল। আচার্য বোধিসত্ত্বর হাতে মেয়েকে তুলে দিয়েছিলেন, আমি দিলাম অর্ণবের হাতে—। নন্দিনী, নন্দিনী—।'

বাবার ডাক শুনে ঘরে ঢুকেছিল নন্দিনী।

ও ঘরে আসতেই ওর দিকে তাকিয়ে ঝলমলে মুখে বলে উঠলেন অধ্যাপক, 'তুমি বড় ভাগ্যবতী মা। ভাগ্য না থাকলে আজকের দিনে বোধিসত্ত্বের মতো পাত্র পেতে না তুমি। পুরো ব্যাপারটা তোমাকে বলে নিই, নাহলে কিছুই বুঝতে পারবে না তুমি।'

নন্দিনী মাথা সামান্য নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। মৃদু গলায় উত্তর দিল, 'আমি সব শুনেছি বাবা।'

'শুনেছ!' কেমন যেন বাচ্চাদের মতো খুশি হয়ে উঠলেন অধ্যাপক।

কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, 'যদ্দূর মনে পড়ছে, সামনের মাসের প্রথমে একটা বিয়ের তারিখ আছে। শুভ কাজে বিলম্ব করা উচিত নয়— এও আমাদের প্রাচীন গুরুদের শিক্ষা। তা, ওই সময় বিয়ের দিন ঠিক করলে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না তো অর্ণব?'

লাজুক মুখে দুদিকে মাথা নাড়িয়ে জবাব দিয়েছিল অর্ণব— না, না, অসুবিধের আর কী আছে! আপনি যা বলবেন তাতেই আমি রাজি।'

'কিন্তু আমি রাজি নই।' মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় কথাটা বলল নন্দিনী।

অধ্যাপক আচার্য একটু অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন, 'তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'ওহ্ বুঝতে পেরেছি, তুমি যে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সটা করছ— তার পরীক্ষা ওই সময়। তাই না?'

নন্দিনীর গলার স্বর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল এবার— 'না, এ বিয়েতেই আমার মত নেই।'

অধ্যাপকের চোখমুখ লালচে হয়ে উঠেছিল । কপালে ভাঁজ পড়েছিল বেশ কয়েকটা। একটু কেটে কেটে উনি বললেন, 'তুমি কিন্তু কখনও আমার কথার অবাধ্য হওনি মা।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিল নন্দিনী— 'তুমিও কিন্তু আমার অমতে কখনও কিছু করোনি বাবা।'

জানলা দিয়ে আসা ঝকঝকে রোদ ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল অনেকটা, কিন্তু ওই রোদও ঘরের এই অস্বস্তিকর আবহাওয়াকে একেবারেই বাগে আনতে পারছিল না। অধ্যাপকের হাতের চুরুট নিবে গিয়েছিল, উনি গম্ভীর মুখে সেটা আর একবার ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'এ বিয়েতে তোমার মত নেই কেন— জানতে পারি কি?'

নন্দিনীর গায়ের রঙ অসম্ভব ফর্সা, ওর মুখ টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছিল। ও কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না।

অধ্যাপক বললেন, 'তুমি সঙ্কোচ কোরো না। মনের মধ্যে কথা পুষে রাখা ঠিক নয়। যা বলার স্পষ্ট করে বলে ফেল। আমার মনে হয়, পড়াশুনো কমপ্লিট না করে তুমি বিয়ে করতে চাইছ না। তাই তো?'

দুদিকে মাথা নাড়াল নন্দিনী, তারপর স্পষ্ট গলাতেই বলল, 'আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।'

'ঠিক! কে ঠিক করল?'

'আমিই ঠিক করেছি।'

অধ্যাপকের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'পাত্র কে?'

নন্দিনীর মুখের চামড়ার নীচে দিয়ে রক্তের তীব্র একটা স্রোত যেন ছুটে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে পরিষ্কার গলায় ও বলেছিল— 'সাত্যকি। অনেক দিন আগে থেকেই আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা ঠিক হয়ে আছে।'

ঘরের সবার চোখ এখন সাত্যকির দিকে। মাথা নিচু করে বসেছিল সাত্যকি।

কিছুক্ষণ থমথমে মুখে বসে থাকার পরে অধ্যাপক মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি বড় হয়েছ, নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু পাঁচজনের সামনে আমার অসম্মান করা কি তোমার পক্ষে ঠিক কাজ হয়েছে? এদের চরিত্র বিচার করার জন্যে আমি যখন সবাইকে চুরি করে আনতে বলেছিলাম— তুমি তো নিষেধ করতে পারতে। বলতে পারতে এসবের প্রয়োজন নেই, আমার বিয়ে আমিই ঠিক করে ফেলেছি। আমাকে তুমি শুধু শুধু অপমান করতে গেলে কেন নন্দিনী?'

শেষের দিকে অধ্যাপকের গলার স্বর রাগ অভিমান আর উত্তেজনায় কেমন যেন

বিকৃত হয়ে উঠেছিল।

রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে উঠেছিল নন্দিনী। 'আমি তোমাকে অপমান করতে যাইনি বাবা, আমি ভেবেছিলাম তুমি ওদের সঙ্গে মজা করছ।'

'যারা আমার ছাত্র, ছাত্রের মতো— তাদের সঙ্গে আমি এইরকম একটা বিষয় নিয়ে মজা করব। এটা তুমি কী করে ভাবলে?'

বলতে বলতে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন অধ্যাপক আচার্য। তারপর হাতের আধখানা চুরুট অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বেশ চড়া গলায় বললেন, 'এ বিয়েতে আমার মত নেই। কিন্তু আমি তোমাকে বাধা দেব না। তুমি বড় হয়েছ, যা ইচ্ছে তাই করবে। তবে একটা কথা— এই বিয়ের পরে এই বাড়ির দরজা তোমার কাছে চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে।' কথাটা বলেই অধ্যাপক লম্বা পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাত্যকি আর নন্দিনী ছাড়া এ ঘরের বাকি চারজনও বেরিয়ে গিয়েছিল।

ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছে নন্দিনী, কিন্তু মা'র অভাব ওকে কখনও বুঝতে দেননি বাবা। বুকে পিঠে করে মানুষ করেছেন। সেই বাবার মনে আচমকা এত বড় একটা আঘাত দেওয়ার জন্যে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছিল নন্দিনী।

সাত্যকি ডাক্তার, পাঁচজন সাধারণ মানুষের তুলনায় ওর নার্ভ ঢের বেশি শক্ত। অঝোরে কাঁদার জন্যে নন্দিনীর চোখের জল ফুরিয়ে যাওয়ার পরে সাত্যকি বলেছিল, 'তোমার বাবা অত্যন্ত পড়াশুনো করা মানুষ, উনি নির্ঘাত জাতকটাতকের অন্য কোনও গল্পের কায়দায় এখন আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন।'

কথাটা শুনে অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়েছিল নন্দিনী। সাত্যকি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী এক চিকিৎসকের গলায় বলল, 'যা বলছি মিলিয়ে দেখো পরে। আমার একটা কথাও ভুল নয়। নিজের মুখে কথাটা বলা ভাল দেখায় না, তবু বলছি— ওই অর্ণব ছোকরার তুলনায় পাত্র হিসেবে আমি ঢের বেশি যোগ্য। ও বড়জোর একটা অধ্যাপকের চাকরি পাবে। চাকরির যা বাজার এখন, মুরুব্বি না ধরলে তাও চট করে পাবে না। এর পর হয়তো অর্ধেক জীবন গাঁ গঞ্জে পড়ে থাকতে হবে, শহরে পোস্টিং পাবে না। আর আমি? আমি চোখের ডাক্তার— সামনে মস্ত ভবিষ্যৎ। নিজের মুখে বলতে খারাপ লাগছে, তবু এটা তো সত্যি— অর্ণবের তুলনায় আমাকে বড়লোকই বলা যেতে পারে। শেষ কথা, এটাও নিজের মুখে বলা ঠিক নয়। কিন্তু বিচারের জন্যে বলতেই হচ্ছে— অর্ণবকে বিচ্ছিরি দেখতে, আর আমি রীতিমত হ্যান্ডসাম। নন্দিনী এবার তুমি ভেবে বলো— এই দুই পাত্রের মধ্যে কোন্ পাত্রকে মেয়ের বাবা জামাই হিসেবে পেতে চায়? না-না, চুপ করে থেকো না, বলো। একটু ভেবেই না হয় উত্তর দাও।'

নন্দিনী কোনও কথাই বলতে পারছিল না। গলার কাছে ভার-ভার, চোখ জলে ভরে উঠেছিল আবার। বাবার শেষের কথাগুলো কানের ওপর আছড়ে পড়ছিল বারবার। বাবার সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে জীবন কাটাবার কথা ও ভাবতেই পারে না।

সাত্যকি বুঝতে পরাছিল না কী ভাবে কথা শুরু করবে আবার। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে বলল, 'সব বাবা মায়ের চাওয়া এক ধরনের। সবাই চায় ছেলেমেয়ে সুখে

থাকুক, শান্তিতে থাকুক। আর কী চায়? মেয়ে হলে মনের মতো জামাই, ছেলে হলে মনের মতো বউ। তোমার বাবার মনের মতো হওয়ার সব যোগ্যতাই আমার আছে। হয়তো বাকি চারজনের চেয়ে অনেক বেশিই আছে। বড়াই করছি না। পাত্র বিচার করতে গেলে বাবা মায়েরা যা-যা দেখে থাকেন, সেই সব দিকে নজর রেখেই বলছি। আজ তোমার বাবা একটু রাগ করেছেন, কাল সেই রাগের কথা ভুলে যাবেন। ভুলে না যাওয়ার কোনও কারণ নেই।'

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে উঠেছিল তরুণ চোখের ডাক্তার সাত্যকির কণ্ঠস্বর। কিন্তু নন্দিনী মাথা নিচু করে বসেছিল। কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকার পরে সাত্যকি বলল, 'তোমার বাবার একটু পরীক্ষা নেওয়ার স্বভাব আছে। আমার মনে হয় উনি আমাদের আর একটা পরীক্ষা নিচ্ছেন।'

মুখ তুলে আবার তাকাল নন্দিনী, ওর সজল চোখের মধ্যে প্রশ্ন। প্রশ্নটা দেখতে পেয়ে উৎসাহিত হয়ে সাত্যকি বলল, 'তোমার বাবা এবার আমাদের প্রেমের পরীক্ষা নিচ্ছেন। জানতে চাইছেন আমাদের প্রেম সত্যি সত্যি কতটা গভীর। আমাদের প্রেম রোমিও জুলিয়েট বা লায়লা মজনুর মতো কি না জানতে চাইছেন। পরীক্ষার বিষয় যদি এটা হয়, আমরা তো একশোয় একশো পেয়ে যাব। তাই না?'

নন্দিনীর সজল চোখে ছোট্ট একটা হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল।

সাত্যকি ঝলমল করে হেসে বলল, 'এবার আমাদের কী করা উচিত বলো?'

নন্দিনী কোনও উত্তর না দিয়ে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে নিল।

'বলো না, কী করা উচিত?'

এবারও প্রশ্নের উত্তর দিল না নন্দিনী, কিন্তু আগের তুলনায় ওকে কিছুটা সহজ স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল।

সাত্যকি বলল, 'তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমি বলছি। চলো আজ বিকেলেই আমরা বিয়ে করে ফেলি।'

খুব মৃদু গলায় নন্দিনী এবার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

সাত্যকি হেসে ফেলে বলল, 'ভয় পেয়ো না, কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করছি না। আমরা একেবারে আইনসম্মত ভাবেই বিয়ে করব।'

নন্দিনীর চোখে এখন আর জল নেই, গলার সেই ভার ভার অবস্থাটাও কেটে গেছে। চাপা গলায় বলল, 'রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করতে গেলে তো শুনেছি ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে এক মাস আগে নোটিশ দিতে হয়।'

'আমিও তাই শুনেছি। কিন্তু এখন তো আমাদের এখানকার পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে গেছে। নোটিশ দিয়ে এক মাস বসে থাকার উপায় নেই। আজকেই বিয়ে করে ফেলতে হবে।'

'কী ভাবে? নোটিশ দিতে হবে তো।'

'দেব। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বৈধ স্বামী স্ত্রী হয়ে যাব।'

'কেমন করে?'

'বিয়ে রেজিস্ট্রি করে।'

'কিন্তু ওই এক মাসের নোটিশ?'

'নোটিশ দেওয়াও হবে, বিয়েও হবে।'

নন্দিনীর অবাক ভাবটা কিছুতেই কাটছিল না। 'কী করে?'

সাত্যকি উঁচু গলায় হেসে উঠে নিচু সুরে বলল, 'না, তোমার দেখছি সত্যি-সত্যি বোধিসত্ত্বের বউ হওয়া উচিত ছিল। আমি বসছি। তুমি চটপট তৈরি হয়ে নাও।'

মিনিট-পনেরোর মধ্যে তৈরি হয়ে নিল নন্দিনী। ওর হাতে একটা বড় হ্যাণ্ডব্যাগ। মুখচোখ অবার বেশ থমথমে হয়ে উঠেছে। ওই চোখমুখ দেখে তাড়া লাগাল সাত্যকি। 'কুইক, অনেকগুলো কাজ সারতে হবে আমাদের।'

নন্দিনীর ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছা করছিল আবার, কিন্তু সাত্যকির তাড়ায় সেটা আর সম্ভব হল না।

গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পা দিতে না দিতেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। নন্দিনীকে নিয়ে ওই ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছিল সাত্যকি। ট্যাক্সি মিনিট-পনেরো ছোটার পরে একটা হলুদ রংয়ের দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছিল ওরা।

সাত্যকি বলল, 'এই বাড়িটার দোতলায় ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস আছে একটা। তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি।'

লম্বা পায়ে বাড়িটায় ঢুকে গেল সাত্যকি। ফিরে এলো মিনিট-দশেক বাদেই। এসে বলল, 'বিয়ের জন্যে এক মাসের নোটিশ দিয়ে এলাম।'

কথাটা শুনে শুকিয়ে উঠেছিল নন্দিনীর মুখ। 'আমি বলেছিলাম না— এক মাসের নোটিশ ছাড়া হয় না।'

'ঠিকই শুনেছ। আমি শুধু নোটিশই দিইনি, বিয়ের সাক্ষীও ঠিক করে এসেছি। নাও চলো এবার।'

'কোথায়?'

'রেজিস্ট্রারের অফিসে। শুভ কাজে বিলম্ব ঠিক নয়।'

আর একবার নতুন করে অবাক হল নন্দিনী।

সাত্যকি রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে হেসে উঠে বলল, 'আয়োজনে কোথাও কোনও ঘাটতি দেখলে আমাদের পুরুতঠাকুররা কিছু মূল্য ধরে দিতে বলেন না? এখানেও আমি কিছু বাড়তি মূল্য ধরে দোষ কাটিয়ে দিয়েছি। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের খাতায় এতক্ষণ বোধহয় একমাস আগের নোটিশ পড়ে গিয়েছে। সাক্ষীও রেডি। চলো চলো।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল সাত্যকি আর নন্দিনীর।

নন্দিনী তখন থেকে কেমন যেন কাঠ হয়ে আছে। তাই দেখে সাত্যকি খোলা গলায় হেসে উঠে বলল, 'তুমি এখন আমার পাকাপোক্ত ভাবে বিয়ে করা বউ। তুমি আর নন্দিনী আচার্য নও, নন্দিনী রায়। স্বামীর নাম ডাক্তার সাত্যকি রায়। তোমার যাবতীয় দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তার অর্ধেক আমাকে দিয়ে দাও। ওটা আমার প্রাপ্য। তুমি এখন থেকে আমার, কী যেন বলে— অর্ধাঙ্গিনী?'

ম্লান মুখে হাসল নন্দিনী।

কাছেই একটা টেলিফোন বুথ ছিল। 'এক মিনিট, আসছি' বলে এই বুথে ঢুকে পড়ল সাত্যকি। ফিরে এলো ঠিক এক মিনিট পরেই। এসে বলল, 'চলো কিছু খাই।'

দুদিকে মাথা নেড়ে জবাব দিল নন্দিনী, 'আমার এখন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'ইচ্ছে না হলেও খেতে হবে জোর করে। তোমার শরীরে চিনির অভাব দেখতে পাচ্ছি। এখানে একটা দারুণ মিষ্টির দোকান আছে। রাজভোগ আর রাবড়ি দারুণ বানায়।'

হাত ধরে প্রায় টেনেই ওই দোকানটায় নন্দিনীকে নিয়ে ঢুকল সাত্যকি।

সত্যিই, এ দোকানের রাজভোগ আর রাবড়ির দারুণ সুনাম। আর অবাক কাণ্ড, খেতে খেতে নন্দিনীর মুখে আবার সেই ঝলমলে হাসিটা ফিরে এসেছিল।

দোকান থেকে বেরিয়ে আবার একটা ট্যাক্সিতে উঠল ওরা। ট্যাক্সি ছোটার পরেই নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছি এখন আমরা?'

উত্তরে গম্ভীর মুখে সাত্যকি বলল, 'বাড়িতে, আমাদের বাড়িতে।'

শুনে আবার কাঠ হয়ে গিয়েছিল নন্দিনী। রাজ্যের দুর্ভাবনা ওর মাথায় এসে ভিড় করেছিল। সাত্যকির বাড়ির লোকরা কী ভাবে নেবে এই বিয়েটাকে কে জানে! হয়তো ওদের বাড়ির দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে মুখের সামনে। তারপর? অদ্ভুত এক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করে দিয়েছিল নন্দিনী।

সাত্যকি কিন্তু নিজের খেয়ালে বকবক করেই যাচ্ছিল। কত কথা, কিন্তু কোনও কথারই মানে ঠিক বুঝতে পারছিল না নন্দিনী। আসলে মানে বোঝার মতো মনের অবস্থা ছিল না ওর। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তায় সারা শরীর কেমন যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ও যা ভেবেছিল, ঠিক তার উল্টো ঘটনাই ঘটল। রীতিমত শাঁখ বাজিয়ে বধূবরণ করা হল। সাত্যকির মা, বৌদি, ছোট বোন, কিছু পাড়া-প্রতিবেশী রীতিমত হৈ-হৈ জুড়ে দিয়েছিল। আনন্দে চোখে জল এসে গিয়েছিল নন্দিনীর।

একটা বুঝি বিয়েবাড়িই হয়ে গিয়েছিল বাড়িটা। সারা দিন হৈ-হৈ এর পরে সাত্যকিকে নন্দিনী আলাদা করে পেয়েছিল রাত্তিরে শোবার ঘরে। একা পাওয়ার পরেই ও চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাড়ির লোকেরা কী করে জানল যে তুমি বিয়ে করে বউ নিয়ে আসছ?'

সাত্যকি এক চোট হেসে নিয়ে বলল, 'না, তুমি দেখছি সত্যিই সরলা বালিকা। টেলিফোন বুথে একবার ঢুকেছিলাম না—।'

'তখন তুমি বাড়িতে সব জানিয়েছিলে?'

'না হলে বাড়ির লোক জানবে কী করে? তোমার কথা আমার ছোট বোন আর বউদিকে অনেক দিন বলেছি। কিন্তু পুরনো দিনের রাজারাজড়ার মতো তোমাকে জয় করে ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়িতে ফিরতে হবে— সেটা জানতাম না। টেলিফোনে বিয়ের কথাটা শুধু বউদিকে বলেছিলাম। তবে আমি নিজেও বুঝতে পারিনি ওরা এই রকম গ্রান্ড রিসেপশনের ব্যবস্থা করবে। এ ব্যাপারে আমার কোনও কৃতিত্ব নেই। যা হয়েছে, সবই আমার স্ত্রীভাগ্যে।'

নন্দিনী হাসল না। নিচু গলায় একটু থেমে থেমে বলল— 'কিন্তু যখন জানবে যে তোমার স্ত্রীভাগ্য ভাল নয়, তখন—।'

অবাক হল সাত্যকি। "আমার মতো স্ত্রীভাগ্য ক'জনের আছে, তুমি খুঁজে বার করো তো? স্ত্রী পরমাসুন্দরী, বিদূষী। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক অধ্যাপকের একমাত্র সন্তান। আর কী চাই!"

নন্দিনীর চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

ব্যাকুল হয়ে পড়ল নতুন বর সাত্যকি। 'কী হল, কাঁদছ কেন?'

নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে নন্দিনী বলল, 'আমার বাবাকে আমি তো চিনি, বাবা কখনোই আমাদের মেনে নেবেন না।'

চোখের ডাক্তার সাত্যকি চোখের জল ফেলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আর কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ কাঁদার পরে নন্দিনী একটু শান্ত হলে সাত্যকি একটা কলম আর রাইটিং প্যাড বউয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, তুমি আমাদের বিয়ের কথাটা জানিয়ে তোমার বাবাকে একটা চিঠি লেখো। আমি কাল সকালে ক্যুরিয়ার সার্ভিসে ওটা পাঠিয়ে দেব।'

কাগজ কলম হাতে নিয়ে নন্দিনী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল, তারপর আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বিয়ের কথা জানিয়ে চিঠি লিখল বাবাকে। শেষে লিখল, 'যেদিন তুমি আমাদের ক্ষমা করতে পারবে, সেদিন গিয়ে তোমাকে আমরা প্রণাম করে তোমার আশীর্বাদ নিয়ে আসব।'

পরদিন সকালেই অধ্যাপক আচার্যের কাছে চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছিল সাত্যকি। একবার ভেবেছিল— একটা ফোন করে জেনে নেবে, চিঠিটা উনি পেয়েছেন কি না। পরে আবার ভেবে দেখল— আদর্শবাদী, নীতিনিষ্ঠ অধ্যাপক চিঠি বা ফোনে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না। বরং ওঁর গোঁ আরও বেড়ে যেতে পারে। তার চাইতে ওঁর পারিবারিক বন্ধু চিত্ততোষ চক্রবর্তীকে ফোন করা যাক। ওই বাড়িতে যাওয়ার সুবাদে ওঁর সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে। অল্পস্বল্প কথাও হয়েছে কয়েকদিন। বেশ স্নেহপ্রবণ মানুষ। এ ব্যাপারে ওঁর সাহায্য চাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু ওঁর টেলিফোন নম্বর পাওয়া যাবে কোথায়? নন্দিনী জানতে পারে। কিন্তু এক্ষুনি এ ব্যাপারে নন্দিনীকে কিছু জানানো ঠিক হবে না ভেবে টেলিফোন ডাইরেক্টরি টেনে নিয়েছিল সাত্যকি।

ডাইরেক্টরিতে এগারোজন চিত্ততোষ চক্রবর্তীর নাম আছে। সাতটা টেলিফোন সারার পরে পাওয়া গেল আসল চিত্ততোষকে। সাত্যকি নিজের পরিচয় দেওয়ার পরে নন্দিনীর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা জানাল। ভদ্রলোক টেলিফোনেই আশীর্বাদ জানাতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সাত্যকি কোনও মতে থামিয়ে দিয়ে জানাল ওরা এখন কী ধরনের সংকটের মধ্যে পড়েছে।

চিত্ততোষবাবু অবাক হয়ে বললেন, "সে কী! আসলে কী জানো, খুব পণ্ডিত মানুষদের কিছু বাতিক থাকে। আমি তো অনেকদিন ধরে ওঁকে চিনি। সব ভাল, তবে বড্ড জেদ। কোনও ব্যাপারে একবার 'না' বললে 'হ্যাঁ' করানো অসম্ভব। ঠিক আছে, আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলছি এই ব্যাপারে। তুমি আমার সঙ্গে পরে যোগাযোগ কোরো।"

।। পাঁচ ।।

পরদিন সন্ধেবেলাতেই চিত্তোতোষবাবু অধ্যাপক আচার্যের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। অনেক বছর ধরে অধ্যাপকের ইনকাম-ট্যাক্সের যাবতীয় ঝামেলা এই মানুষটি সামলান। সেই সুবাদেই পারিবারিক বন্ধুতা। কাজকর্মের বাইরেও উনি আসেন। অধ্যাপকের কাজের চাপ বা বাইরের বিশিষ্ট অতিথি না থাকলে ঘরোয়া বিষয় নিয়ে গল্পও চলে।

অধ্যাপক ওঁর ইজিচেয়ারে শুয়েছিলেন। হাতের চুরুটের ছাই বেড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু চুরুটে টান দিচ্ছিলেন না।

দু-চারটে কথার পরেও চিত্ততোষ বললেন, 'নন্দিনীকে দেখছি না তো। ও কি ফেরেনি এখনও?'

আজ বিকেলেই নন্দিনীর চিঠি অধ্যাপকের হাতে এসেছে। চিঠি ওঁর পাশেই ছিল, প্রশ্নের উত্তরে চিঠিটা উনি চিত্ততোষের হাতে ধরিয়ে দিলেন। চিঠিটা পড়ে চিত্ততোষ বললেন, 'বাহ্! এ তো খুব আনন্দের খবর। একেই বলে রাজযোটক। সাত্যকি ডাক্তার, শুধু যে একটা এম বি বি এস ডিগ্রি নিয়ে বসে আছে তা নয়, অপথালমোলজিস্ট। চোখের ডাক্তাররা তো মানুষের অশেষ উপকারে লাগে। তাছাড়া ছেলেটিকে দেখতেও ভারী সুন্দর। আমাদের নন্দিনীর সঙ্গে ওকে চমৎকার মানাবে। কিন্তু নন্দিনীর সঙ্গে আপনার কি কোনও মান অভিমানের ব্যাপার হয়েছে? এই যে শেষের দিকে লিখেছে— যেদিন তুমি আমাদের ক্ষমা করতে পারবে, সেদিন গিয়ে তোমাকে আমরা প্রণাম করে তোমার আশীর্বাদ নিয়ে আসব।'

অধ্যাপক দুদিকে মাথা নেড়ে বললেন, 'না, এটা কোনও মান-অভিমানের ব্যাপার নয়। এটা নীতির প্রশ্ন। ওকে ক্ষমা করার কোনও প্রশ্নই উঠছে না।'

চিত্ততোষ সাত্যকির কাছ থেকে সবই শুনেছেন, কিন্তু অবাক হওয়ার ভান করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নীতি?'

অধ্যাপক অনেকক্ষণ বাদে চুরুটে একটা টান দিলেন। তারপর যখন ধোঁয়া ছাড়ছিলেন তখন চিত্ততোষের মনে হল— ওই ধোঁয়ার সঙ্গে ওঁর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও বেরিয়ে গেল। অধ্যাপক গম্ভীর গলায় বললেন, 'মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিস নীতি, আদর্শ। এগুলো বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না। আমি অন্তত চাই না। আমার জীবনে এই ধরনের কঠিন কয়েকটা পরীক্ষা আগে এসেছিল, কিন্তু আমি কখনও হার স্বীকার করিনি। আরও একটা কঠিন পরীক্ষা এসেছে এবার, তবে আমি আপনাকে বলছি, আমি হারব না। যত কষ্টই হোক না কেন, আমি আমার নীতিতে অবিচল থাকব।'

'কিন্তু কী হয়েছে, আপনি কি একটু ভেঙে বলবেন? নন্দিনী আপনার মেয়ে, কিন্তু আমারও ও মেয়ের মতো। মনে হয়, কোথাও একটু ভুল-বোঝাবুঝি হয়ে গেছে।'

'না, এটা ভুল-বোঝাবুঝি নয়, আবারও বলছি — নীতির প্রশ্ন।'

'কিন্তু নীতির প্রশ্ন উঠছে কেন? একটু পরিষ্কার করে বলুন, যদি অবশ্য আপনার কোনও আপত্তি না থাকে—।'

অধ্যাপক চুরুটে আরও দু তিনটে টান দেওয়ার পরে জাতককাহিনীর ধরনে পাঁচজনেব

পরীক্ষা নেওয়ার কথা শুনিয়ে বললেন, 'প্রাচীন যুগে বোধিসত্ত্ব যেভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল, অর্ণবও ঠিক সেই ভাবেই পাশ করেছে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য— অমন আদর্শবান ছেলের সঙ্গে আমি নন্দিনীর বিয়ে দিতে পারলাম না! নন্দিনী পাঁচজনের সামনে আমার মাথা হেঁট করে দিয়েছে। আমার কথার কোনও মূল্যই নেই ওর কাছে।'

চিত্ততোষ শুধুমাত্র ইনকাম-ট্যাক্সের কাজকর্ম করেন, কিন্তু উকিল তো। তাই একটু উকিলি প্যাঁচ কষলেন। 'আপনার মাথা হেঁট করাটা সত্যিই খুব দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন— কোন্‌টা বড়— এই ঘটনাটা, না নন্দিনীর নতুন জীবন?'

প্যাঁচে নিজের জায়গা থেকে একটু বুঝি পিছিয়ে গেলেন অধ্যাপক।

উৎসাহিত হয়ে চিত্ততোষ মুখ খুললেন আবার। 'নন্দিনী আপনাকে অসম্ভব ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। পাঁচজন তো দূরের কথা, কেউ ধারেকাছে না থাকলেও আপনার মনে কষ্ট দেওয়ার মতো একটা কথাও ও বলবে না। মাথা হেঁট করানোর তো প্রশ্নই উঠছে না। আমার মনে হয়, কোথাও একটা ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে।'

অধ্যাপক আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছেন। 'আপনি ভুল করছেন। এটা ছোটখাটো বিষয় নয়, ভুল বোঝাবুঝিও নয়। এটা আমার নীতির প্রশ্ন। জাতককাহিনীর আদলে পাঁচজনের যখন পরীক্ষা নিচ্ছিলাম, ও এসে তো আমকে বাধা দিতে পারত।'

'কেন, বাধা দেবে কেন? বাধা দিলে অসম্মান করা হত আপনাকে।'

'বেশ, ও ওর আপত্তির কথা জানাতে পারত।'

'আপনি কি ওর মতামত জানতে চেয়েছিলেন?'

'চাওয়াচায়ির কোনও ব্যাপার নেই। ও আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই ঘটনাটার কথা জানিয়ে দিলে ওই অপমানজনক অবস্থার মধ্যে আমাকে পড়তে হত না।'

'আপনি কি করতে যাচ্ছেন? আপনার উদ্দেশ্যটা কী? ও আগে থেকে ধরে নেবে কী করে? তাছাড়া ও হয়তো ভেবেছিল— আপনি ওই পাঁচজনের সঙ্গে কুইজ গোছের কিছু করছেন।'

এবার একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন অধ্যাপক। 'এভাবে বাইরের লোক ভাবতে পারে, কিন্তু নন্দিনী ভাববে কেন? ও তো আমার প্রকৃতি জানে। সব চাইতে দুঃখের কথা কী জানেন? অর্ণব হুবহু বোধিসত্ত্বের ধরনে পাশ করল পরীক্ষায়—। ওর হাতে মেয়েকে তুলে দেওয়ার কথা দিলাম সবার সামনে, কিন্তু নন্দিনী সে কথা আমাকে রাখতে দিল না।'

চিত্ততোষ দুদিকে মাথা নাড়লেন দু-তিনবার, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আপনার মতো পণ্ডিত মানুষের কাছে এই নিয়ে কথা বলা আমাকে মানায় না। তবু বলছি। এ যুগটা হল কম্পিউটারের যুগ। হাতের কাছে ইন্টারনেট। চোখের পলকে ই-মেল পৌঁছে যায় পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। এই যুগে আড়াই হাজার বছর আগেকার জাতককাহিনী, বুদ্ধদেবের পরীক্ষা দেওয়া বা নেওয়ার স্টাইল কি চলে?'

অধ্যাপক আর একবার উত্তেজিত হলেন। 'কী বলছেন আপনি? আমাদের সনাতন নীতি, ধর্ম, দর্শন— সবই তো পুরনো দিনের। ওগুলো পুরনো বলেই কি বাতিল করা

যায়?'

চিত্ততোষ একটু আমতা-আমতা করে বললেন, 'না, তা ঠিক নয়। তবে বলছিলাম কি—।'

'বলাবলির আর কিছু নেই। আপনার যদি অন্য কোনও বিষয় নিয়ে কিছু বলার থাকে, আপনি তাই নিয়েই বলুন।'

দমে গেলেন চিত্ততোষ চক্রবর্তী।

আরও মিনিট পনেরো উনি ছিলেন অধ্যাপকের বাড়িতে, কিন্তু কোনও বিষয়েই কথা তেমন গড়াল না। শেষে উনি উঠে পড়ে বললেন, 'আজ চলি, পরে আসব আবার।'

সেই রাতেই চিত্ততোষের বাড়িতে ফোন এলো সাত্যকির। চিত্ততোষ বললেন, 'অধ্যাপকের সঙ্গে এই নিয়ে আজ সন্ধেয় অনেক কথা হয়েছে আমার। বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। অসম্ভব একবগ্‌গা লোক। একটাই পথ আছে—সেটা হল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পথ। কিন্তু সে পথের কোনও হদিশ পাচ্ছি না। কাল রোববার। পারলে সকালের দিকে একবার চলে এসো আমার বাড়িতে। তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করে দেখি— ঠিক পথটা খুঁজে পাওয়া যায় কি না। এই ব্যাপারে নন্দিনীকে এখন কিছু আর বলার দরকার নেই।'

চিত্ততোষের কথায় লম্বা করে সায় দিয়ে ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা লিখে নিয়েছিল সাত্যকি।

।। ছয়।।

চিত্ততোষ চক্রবর্তীর সঙ্গে শুধু একদিন নয়, বেশ কয়েক দিন ধরে বিস্তর আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিল সাত্যকি। তারপর যে পথটা বেরিয়েছিল তা যেমন অভিনব তেমন নিঁখুত। পথ খুঁজে পেতে এবং সেই পথ সড়গড় করে নিতে পাক্কা পাঁচটা মাস সময় লেগে গিয়েছিল।

চিত্ততোষ ওদিকে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন অধ্যাপকের সঙ্গে, কিন্তু অধ্যাপকের চিত্তে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আনতে পারেননি।

অধ্যাপক আচার্য ওঁর একমাত্র সন্তান নন্দিনীকে অসম্ভব ভালবাসেন। কিন্তু এই অপত্য স্নেহের চাইতেও ওঁর কাছে যেটা ঢের বেশি বড় হয়ে উঠেছিল তা হল ওঁর নীতি আর আদর্শ।

এগুলোর কিছু-কিছু অনেকের কাছে বিদ্‌ঘুটে ঠেকে, কিন্তু মানুষটি কোনও অবস্থাতেই ওঁর পথ থেকে একচুলও সরতে চান না। জানেন, কেউ-কেউ আড়ালে ওকে একটু খ্যাপা বলে। কিন্তু তাতে ওঁর কিছু এসে যায় না। উনি বরং মুচকি হাসেন।

পৃথিবীতে সব যুগেই তো প্রতিভাবানদের পাগল বলা হয়েছে। সেই বিচারে সক্রেটিস পাগল ছিলেন, পাগল ছিলেন গ্যালিলিও। কারও কারও মতে বিদ্যাসাগরও অল্পবিস্তর পাগল ছিলেন। এই হয়ে থাকে, এটাই নিয়ম। প্রতিভাবানরা সাধারণ মানুষের অনেক আগে চলেন বলেই এই বিভ্রম হয়।

জ্ঞানী ব্যক্তিদের মস্ত একটা তালিকা মুখস্থ আছে অধ্যাপকের। ওঁর একটা লুকনো বাসনা হল— ওই তালিকায় শেষের দিকে একদিন ওঁর নামও ফুটে উঠুক।

একটা কথা উনি প্রায়ই খুব জোর দিয়ে বলে থাকেন। তা হল, ওঁর অহংবোধ বলে কিছুই নেই। কিন্তু কাছের ও দূরের বেশ কিছু লোক জানেন, আসল ঘটনাটা ঠিক তার উল্টো। খুব তুচ্ছ একটা ব্যাপারেও উনি যদি একবার গোঁ ধরেন, সেটা ভাঙানোর সাধ্য নেই কারও। বড় কোনও বিষয়ে জেদ ধরলে তা পাল্টাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। নন্দিনীর বিয়ে এমনই একটা ঘটনা।

বোধিসত্ত্বের মতো জামাই হারানোর দুঃখ উনি একদিনের জন্যেও ভুলতে পারেননি। ছি-ছি! অর্ণব ছেলেটা কী ভাবল। ওই ঘটনার কথা ভাবলে শুধু দুঃখকষ্টই নয়, ব্যর্থতাবোধ আর অপমানের গ্লানি চেপে ধরে ওঁকে। অবিকল বোধিসত্ত্বের স্টাইলে পরীক্ষায় পাশ করেছিল অর্ণব, কিন্তু উনি তো সেই প্রাচীন বারাণসীর গুরুর কায়দায় নিজের মেয়েকে ওর হাতে তুলে দিতে পারেননি। এর জন্য দায়ী নন্দিনী, দায়ী সাত্যকি। এদের ক্ষমা করার তাই কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তা, এই সব নিয়েই পাঁচটি মাস কেটে গিয়েছিল।

উকিল চিত্ততোষের সঙ্গে বিস্তর পরামর্শ করার পরে কাজ উদ্ধারের যে পথটি সাত্যকি নিয়েছিল, কাজ চলতে লাগল সেই পথেই। নিখুঁত কাজ। প্রতিটি পর্যায়েই যথেষ্ট পরিমাণে সতর্কতা। ঠিক যেমন ভাবে চেয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই কাজটি সম্পূর্ণ হল একদিন। পরিকল্পনা অনুসারে কাজের কথা বিন্দুবিসর্গও জানানো হয়নি। নন্দিনী মনের মতো স্বামী পেয়েছে, মনের মতো শ্বশুরবাড়ি, কিন্তু ওর মনে একটা কাঁটা সব সময়ই খচখচ করে— বাবা ওদের মেনে নেয়নি। বাবার প্রকৃতি খুব ভাল ভাবেই জানে মেয়ে। ভবিষ্যতে মিটমাট হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। মনের দুঃখ নন্দিনীর প্রতিদিনই একবার করে বাড়ে। বাড়লে আড়ালে গিয়ে চোখের জল ফেলে নিজেকে খানিকটা শান্ত করে।

সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে সাত্যকি হাসিমুখে নন্দিনীকে বলল, 'যাক, পুরো ব্যাপারটা মিটে গেছে। আর ভয় নেই। চলো, তোমার বাবাকে প্রণাম করে আসি আমরা।'

বাবার কথা উঠতেই নন্দিনীর চোখ জলে ভরে উঠেছিল। কিন্তু চট করে ও চোখের জল মুছে ফেলে জিজ্ঞেস করল, 'কী মিটে গেছে?'

'ভুল-বোঝাবুঝি, আবার কী?'

হতাশ গলায় নন্দিনী বলল, 'আমার বাবাকে তুমি চেনো না। ভাঙবে তবু মচকাবে না।'

অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে সাত্যকি বলল, 'ভাঙা বা মচকাবার প্রশ্ন উঠছে কেন? ওঁর সঙ্গে আমাদের যে কোনও প্রতিযোগিতা নেই। যার ওপর ভিত্তি করে উনি আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন— সেটাই মিটে গেছে। চলো চলো, আর দেরি কোরো না। সন্ধে হয়ে গেলে বাইরের লোকজন এসে যেতে পারে।'

একই প্রশ্ন নন্দিনী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আরও অনেকবার করেছিল, কিন্তু সাত্যকি আর উত্তর দেওয়ার মধ্যে যায়নি। একটাই কথা—'চলো-চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ট্যাক্সিতে উঠে সাত্যকি বলল, 'আসল ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলেই দেখবে সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।'

'কী আসল ব্যাপার?'

'একটু ধৈর্য ধরো, একটু পরেই জানতে পারবে।' ব্যস, এই কথাটা বলার পরেই মুখে তালাচাবি এঁটে দিয়েছিল সাত্যকি।

আধঘন্টার মধ্যেই ট্যাক্সি পৌঁছে গিয়েছিল অধ্যাপক আচার্যের বাড়ির কাছে। ট্যাক্সি থেকে নামার পর বুক দুরদুর করতে শুরু করে দিয়েছিল নন্দিনীর।

সন্ধে হবে-হবে করছে, আকাশে বেলাশেষের আলো। অধ্যাপক নিজের স্টাডিতে বসে টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে কাজ করছিলেন। বাড়ির পুরনো কাজের লোক নন্দিনীদের দেখেই ছুটে এসে দরজা খুলে দিয়েছিল। নন্দিনী কিন্তু বাড়িতে পা দিতে ভরসা পাচ্ছিল না। সাত্যকিই হাত ধরে ওকে নিয়ে এলো অধ্যাপকের স্টাডিতে। মেয়েকে দেখেই চমকে উঠেছিলেন বাবা। একটা খুশির রেখা ফুটে উঠেছিল ওঁর চোখেমুখে, কিন্তু মাত্র এক মুহূর্তের জন্য। তারপর মুখচোখ অসম্ভব থমথমে হয়ে উঠেছিল অধ্যাপকের।

সাত্যকি নিচু গলায় বলেছিল, 'আমরা আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি।'

'প্রণাম। আমি যে তোমাদের প্রণাম নেব না, সে-কথা তো আগেই বলে দিয়েছি।'

রীতিমত গম্ভীর গলায় কথাটা বলেছিলেন অধ্যাপক, কিন্তু সাত্যকি একটুও দমে না গিয়ে সহজ গলায় বলেছিল, কিন্তু যে কারণে আপনি প্রণাম নিতে চান না, সেই কারণটাই তো ভুয়ো।'

অবাক হলেন অধ্যাপক। ওঁর কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়ল, দৃষ্টি তীক্ষ্ম হল। 'ভুয়ো।' কী বলতে চাইছ তুমি?'

সাত্যকি খুকখুক করে কেশে নিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'বলছি। আচ্ছা, জাতকের গল্পে ঠিক যে কায়দায় চরিত্র যাচাইয়ের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, আপনিও তো ঠিক সেই কায়দায় নিয়েছিলেন— তাই তো?'

প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না অধ্যাপক আচার্য।

সাত্যকি উত্তর পাওয়ার জন্যে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পরে মুখ খুলল আবার। 'আপনি পরীক্ষা নিয়েছিলেন, আর পাশ করেছিল একমাত্র অর্ণব। যা-তা পাশ নয়, একেবারে বোধিসত্ত্বের কায়দায় পাশ। ওর ওপর আপনার তাই খুশি হওয়ার কারণটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি যদি এখন জানতে পারেন যে, অর্ণব পরীক্ষায় টুকে পাশ করেছে— আপনার কী প্রতিক্রিয়া হবে।'

রীতিমত থতমত খেয়ে গিয়ে অধ্যাপক আচার্য জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

সাত্যকি এবার ঝুলি থেকে বেড়াল বার করবার কায়দায় বলল, 'সেই কথাটা বলার জন্যেই আজ এখানে আসা। আপনি পরীক্ষাটা নেওয়ার আগেই একবার বলে ফেলেছিলেন যে, গল্পটা জাতকের গল্প থেকে নেওয়া, ব্যস—।'

'ব্যস কী?'

অর্ণব তিন বছর গবেষণা করে ডক্টরেট পেয়েছে। গবেষণা মানেই কথায় কথায় রেফারেন্স বই ঘাঁটা। আবার গাদা-গাদা রেফারেন্স বই মানেই ন্যাশনাল লাইব্রেরি। ব্যস, যেই আপনার কাছে জাতক কাহিনীর কথা শুনেছে অমনি ছুটেছে লাইব্রেরিতে। ওখানে জাতকের গল্প উল্টে উল্টে জেনে যায় আপনি কোন্ গল্পটার কথা বলছিলেন। তার পরের ব্যাপারটা

খুব সহজ। গল্প পড়ে প্রশ্ন আর উত্তরটা সড়গড় করে ফেলেছিল। এ একেবারে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। এবার আপনিই বলুন, আপনি তো অধ্যাপক— কোনও ছাত্র প্রশ্ন ফাঁস করে উত্তর লিখলে আপনি সেটাকে কী ভাবে নেবেন?'

উত্তেজনায় অধ্যাপক আচার্যের মুখ লালচে হয়ে উঠেছিল। উনি বললেন, 'সে কী! অর্ণব আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করল!' তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে সাত্যকির চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তুমি এ ব্যাপারটা কী করে জানলে?'

প্রশ্নটা শোনার জন্যে সাত্যকি যেন তৈরি হয়েই ছিল, ও চটপট উত্তর দিল, 'আমি জানতাম এ প্রশ্ন আপনি করবেন। শুধু আপনি কেন, আপনার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে তিনিও করতেন। আমি অর্ণবকে বলেছি— তুমি বলছ যখন আমি স্যারকে সব বলব। তবে সবচেয়ে ভাল হয় তুমি নিজে এসে বললে—। এই তো, ওর আসার সময় হয়ে গিয়েছে, ও এলো বলে।'

সত্যিই তাই, মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে অর্ণব এসে ঢুকল ওখানে। ওর মাথাটা নীচের দিকে ঝোঁকানো। ওকে দেখে উত্তেজনায় অধ্যাপকের মুখ আর একবার লাল হয়ে উঠেছিল। গম্ভীর গলায় উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'যা শুনছি তা কি সত্যি অর্ণব? তুমি কি বোধিসত্ত্বের উত্তরটা আগে থেকে মুখস্থ করে পরীক্ষা দিতে এসেছিলে আমার কাছে?'

মাথা আরও খানিকটা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে মিনমিনে গলায় উত্তর দিল অর্ণব, 'হ্যাঁ স্যার, কিন্তু আমি—।'

অধ্যাপক আচার্য হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আমার আর কিছু শোনার দরকার নেই। তুমি এখন আসতে পারো।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে অর্ণব যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

অধ্যাপক কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকার পরে একটা চুরুট ধরিয়েছিলেন, তারপর শান্ত মুখে ওটা কিছুক্ষণ টানার পরে আরও শান্ত গলায় সাত্যকি আর নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'আমি না জেনে তোমাদের সঙ্গে খুব অন্যায় ব্যবহার করেছি। পারলে আমাকে ক্ষমা কোরো।'

এমন কথা এমন অধ্যাপককেই মানায়।

সাত্যকি আর নন্দিনী সঙ্গে সঙ্গে উঠে গিয়ে প্রণাম করেছিল ওঁকে।

অধ্যাপক আচার্য দু-হাত দিয়ে দুজনকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করেছিলেন প্রাণভরে।

।। সাত ।।

নন্দিনীর জীবনে মস্ত বড় একটা দুঃখ ছিল। বাবাঅন্ত প্রাণ, কিন্তু সেই বাবাই ওর মুখ দেখেন না। সাত্যকি ছাড়া আর কোনও ছেলেকে বিয়ে করার কথা নন্দিনী কল্পনাও করতে পারত না। সেই সাত্যকিকে ও পেয়েছে, কিন্তু তার জন্যে ওকে যে মূল্য দিতে হয়েছে তা মর্মান্তিক। বাবার কথা ভেবে ও প্রতিদিন একবার না একবার চোখের জল ফেলত। সেই জল ফেলার দিন ফুরিয়েছে এবার। অর্ণব নিজের মুখে ওর কারচুপির কথা

বলতেই ম্যাজিকের মতো সবকিছু পাল্টে গেছে। আবার আগের মতো হয়ে গেছেন বাবা। মেয়ে আবার আগের জায়গায়।

অধ্যাপক আচার্যের ভক্তদের প্রথম সারিতে ছিল সাত্যকি, আবার ও ফিরে এসেছে নিজের জায়গায়। ভক্ত আজ প্রিয় জামাই। নন্দিনীর এখন ঘরে বাইরে সুখ। সুখের জোয়ারে ও ভেসে বেড়ায়। শুধু একটা ব্যাপারে ওর খটকা কাটতে চায় না কিছুতেই। অর্ণব যে আগে থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে জাতকের গল্প পড়ে এসে বাজিমাত করেছিল, সে কাহিনী সাত্যকি জানল কোত্থেকে? এটা কেবল নয়, অর্ণব যে অধ্যাপকের কাছে এসে দোষ স্বীকার করবে— তাও জানা ছিল সাত্যকির। কী করে?

প্রশ্নগুলো বেশ কয়েকবার করেছে নন্দিনী, কিন্তু সাত্যকি একবারও উত্তর দেয়নি। উল্টোপাল্টা কথা টেনে এনে প্রসঙ্গ চাপা দিয়েছে, কিংবা দরকারি কাজের অছিলায় কেটে পড়েছে ওখান থেকে। তবে প্রশ্নগুলো নন্দিনীর মধ্যে থেকেই গিয়েছিল।

সুখের সময় সব মানুষই কিছুটা অসতর্ক হয়ে পড়ে। তখন একটু চাপ দিলে গোপন কথা বেরিয়ে আসে ভেতর থেকে। তা, সেদিন মাঝরাতে এমন এক অসতর্ক মুহূর্তে নন্দিনী চেপে ধরেছিল সাত্যকিকে। 'আজ তোমাকে আসল কথাটা বলতেই হবে।'

আচ্ছন্ন শরীরের আড়মোড়া ভেঙে ছোট্ট একটা হাই তুলে সাত্যকি বলেছিল, 'আমি তো নকল কথা তোমাকে কখনও বলি না।' কোনওরকম ভণিতার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করল নন্দিনী। 'অর্ণব যে বোধিসত্ত্বের কায়দাটা লাইব্রেরিতে গিয়ে জাতক পড়ে জেনে এসেছে— সেটা তুমি জানলে কী করে?'

সাত্যকি এবার লম্বা একটা হাই তুলে বলল, 'তুমি এখন ঘুমোও তো, কাল সকালে বলব।'

'না, কাল কাল বলে প্রসঙ্গটা বহুদিন চাপা দিয়েছ, আজ তোমাকে বলতেই হবে। অর্ণবের ওই চুরির ব্যাপারটা তুমি জানলে কী করে?'

'জেনেছি।'

'সে তো বটেই, কিন্তু কী করে?'

'কী আশ্চর্য, কদ্দিনের কথা, অত সব মনে আছে নাকি!'

'খুব আছে। আজ তোমাকে বলতেই হবে।'

'ওহ্! তুমি দেখছি পুলিশি জেরা শুরু করে দিলে।'

'এখন জেরা করছি। উত্তর না দিলে থার্ড ডিগ্রি শুরু করে দেব।'

'সেটা আবার কী?'

'অত্যাচার। আমার মনের ওপর যেটা তুমি এতদিন ধরে চালিয়ে আসছ, সেটাই করব।'

'আরে! আমি আবার অত্যাচার চালালাম কবে?'

'দিনের পর দিন প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া আর অত্যাচার চালানো একই ব্যাপার—।'

'কী এমন হাতিঘোড়া ব্যাপার যে সব তোমাকে খুঁটিয়ে জানাতে হবে। ওই অর্ণব ছোকরা যে দু-নম্বরি, এটা তো প্রমাণ হয়ে গেছে।'

'না হয়নি। আমার প্রশ্ন— তুমি সেটা জানলে কী করে?'

রহস্যময় হাসি হাসল সাত্যকি। 'মাকিয়াভেলির নাম শুনেছ?'

প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না নন্দিনী।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে আবার মুখ খুলল সাত্যকি। 'এই মাকিয়াভেলি লোকটা মস্ত কূটনীতিবিদ। আজকের দিনে প্রতিটি ব্যাপারে ওকেই মানা উচিত বেশি করে। এই মানুষটি বলেছেন, ফল পাওয়াটাই আসল। সেই ফল কী ভাবে এল— ভাল পথে না খারাপ পথে— সেটা বড় কথা নয়।'

নন্দিনীর গলার স্বর এবার আগেকার চাইতেও স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ। 'কী হয়েছে তুমি যদি না বলো, কাল আমি অর্ণবের কাছে যাব। ব্যাপারটা আমাকে জানতেই হবে।'

'নাহ্। তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। শোনো তাহলে।'

মাঝরাত, চারদিক নিস্তব্ধ। অর্ণবের বোধিসত্ত্ব সাজার গল্প শুরু করল সাত্যকি। 'আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর দাদার বাড়িতে কিছুদিন হাউস ফিজিশিয়ান ছিলাম আমি। এখনও যাই, তবে মাঝেমধ্যে। ওদের বাড়ির সবাই অল্পবিস্তর চোখের রোগে ভোগে। তার জন্যে রেগুলার চেকআপ। চশমার পাওয়ার-টাওয়ার পাল্টাতে হয় প্রায়ই। তা, শিক্ষামন্ত্রীর দাদার মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্তরটাত্তর দেখা হচ্ছিল প্রায়ই; কিন্তু ভাল ছেলে পাওয়া যাচ্ছিল না। মেয়েটিকে দেখতে-শুনতে খারাপ নয়, তবে এক চোখে মাইনাস নাইন আর এক চোখে মাইনাস ইলেভেন। আমার পজিশন ও-বাড়িতে ফ্যামিলি-ফ্রেন্ড মার্কা। ভদ্রলোক একদিন আমাকে বললেন— দেখুন তো, আপনার জানাশোনা কোনও ভাল পাত্র আছে কি না—। মেয়ের বয়েসও হয়ে যাচ্ছে—। সঙ্গে সঙ্গে অর্ণবের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আমার। বলেছিলাম, আমার হাতে দারুণ একটা পাত্র আছে, তবে একটাই সমস্যা—। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, কী সমস্যা? বললাম, অত্যন্ত ভাল ছাত্র, এম এ-র রেজাল্টও দুর্দান্ত। কলেজে পড়াবার খুব শখ, কিন্তু কোথাও চান্স পাচ্ছে না—। এম্প্যানেল্ড হয়ে বসে আছে কবে থেকে। ও যদি কলকাতার কোনও কলেজ-টলেজে চান্স পায়, মনে হয় বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে। উত্তরে মেয়ের বাবা বলেছিলেন, ঠিক আছে আপনি ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমি এদিকে নবকে বলছি—।'

'নব কে?'

'নবই তো এ খেলার চাবিকাঠি। নব শিক্ষামন্ত্রীর ডাকনাম। মন্ত্রী ওর পেয়ারের ভাইঝির হবু বরের জন্যে কলেজে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবে— এ আর কী এমন বড় কথা। অর্ণবের অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারও ভাল, সুতরাং এদিক-ওদিক করার দরকার নেই। মন্ত্রীর একটা ফোন মানেই চাকরি। মন্ত্রীর দাদার এই কথাটা শোনার পরেই আমি ছুটেছিলাম অর্ণবের কাছে।'

'ছি-ছি এই ধরনের প্রস্তাব নিয়ে কেউ কী যায়!'

'কেন? প্রস্তাবটা খারাপ কোথায়? একই সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা।'

'আহা ! কী আমার রাজকন্যার ছিরি—।'

হঠাৎ রাজকন্যার ওপর কেন রাগ হল নন্দিনীর— বুঝতে পারল না সাত্যকি।

একটুখানি থমকে থাকার পরে আবার মুখ খুলল সাত্যকি। 'অর্ণবকে বললাম, শিক্ষামন্ত্রীর আদরের ভাইঝি, তার মানে ভেবে দেখো কী বিরাট কানেকশন। তুমি যে রাতারাতি কোথায়

উঠে যাবে কল্পনাও করতে পারছ না। তাছাড়া মেয়েটিকে দেখতে সুন্দর, লেখাপড়ায় ভাল। রাজি থাকলে বলো। এ সুযোগ আর কখনও পাবে না। সব শুনে অর্ণব বলল: আমি রাজি।'

'বাহ্। দেখল না শুনল না। তুমি বললে আর ও অমনি বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল!'

'কেন হবে না। অর্ণব বুদ্ধিমান ছেলে।'

'ছাই বুদ্ধিমান।'

হঠাৎ অর্ণবের ওপর নন্দিনী কেন এত চটে গেল বুঝতে পারল না সাত্যকি। এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে আগের কথার জের টেনে বলল, বুদ্ধিমান তো বটেই। আজকেব দিনে চাকরি পাওয়া কী কঠিন— কিছুকাল বেকার থেকে সে-কথা ও হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছে। চেষ্টা তো কম করেনি— আমাকে সব বলেছিল—। তারপর বলল, বিয়ে তো একটা করতেই হবে; আর চাকরিও দরকার। পৃথিবীতে কেউ কখনও নিজের বউ আর নিজের চাকরি নিয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়নি। সুতরাং আমার কোনও খুঁতখুঁত নেই।'

'সত্যি বলল?'

'কী আশ্চর্য, ওর মুখে মিথ্যে কথা বসিয়ে আমার কী লাভ?'

এবার রীতিমত চটে গেল নন্দিনী। 'ইশ্! কী বাজে ছেলে! সেদিন ও তাহলে বাবাব সামনে বোধিসত্ত্ব সেজেছিল কেন?'

'ওই এক হিসেব। তোমার বাবার কানেকশন কিছু কম নেই। ধরাকরা করলে জামাইয়েব একটা চাকরি ঠিক জুটিয়ে দিতে পারতেন। তোমার বাবার টাকাপয়সা, সম্পত্তিটম্পত্তি ভালই আছে। তুমি বাবার একমাত্র সন্তান। তাছাড়া তুমি পরমাসুন্দরী, মন্ত্রীর ওই ভাইঝি তোমার ধারেকাছে আসতে পারে না। তোমাকে বিয়ে করা আর লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পাওযা এক ব্যাপার।'

'বাজে কথা বলো না তো।'

'বাজে কোথায়, একেবারে খাঁটি কথা। একটু নির্লজ্জের মতো বলছি, আমার তবু কিছু যোগ্যতা আছে, কিন্তু ওই অর্ণব ছোকরার কী আছে বলো? তুমি নিজেই মিলিয়ে দেখো—।'

নন্দিনীর মাথায় পুরনো যুক্তিবুদ্ধি কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল আবার। ও সাত্যকিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি কিন্তু আসল কথাটা এখনও বলোনি। অর্ণব ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে জাতককাহিনী আগে থেকে পড়ে এসেছিল— এটা তুমি কী করে জানলে?'

'ও বলেছিল।'

'ও খামোখা তোমাকে ও কথা বলতে যাবে কেন?'

'তুমি জেরা করতে পারো বটে! ও বলেনি, আমি বলেছি।'

'তুমি বলেছ?'

'বলেছি মানে ওকে বলতে বলেছিলাম। বলেছিলাম— তোমার বাবার কাছে গিয়ে ও যেন দোষ স্বীকার করে নিয়ে এই কথাগুলো বলে।'

'দোষ করেনি তবু দোষ স্বীকার! তুমি অর্ণবকে দিয়ে মিথ্যে বলিয়েছ।'

'মিথ্যে কেন, সত্যিও তো হতে পারে। আমি যেটা আন্দাজে বলছি সেটা হয়তো

সত্যিই। সত্যি-সত্যিই ও হয়তো সেদিন দু-নম্বরি করেছিল। তোমার বাবা একটু বেশি মাত্রায় আদর্শবাদী, জানে ও লোকটাকে কাত করার এটাই হল সবচেয়ে সোজা রাস্তা। কাজও হয়েছিল চমৎকার। তোমার বাবা টিভির দ্রোণাচার্যের মতো ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল ভক্ত শিষ্যকে— ।'

নন্দিনী অন্য কথা ভাবছিল, অন্য রকম গলায় বলল, 'আমার কিন্তু এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি শেখালে আর ও বাবার কাছে গিয়ে মিথ্যে কথা বলে এলো।'

'মিথ্যে তো আর এমনি-এমনি বলেনি। ওটা তো শর্তের মধ্যে ছিল। অর্ণবকে বলেছিলাম— তুমি ওঁর কাছে গিয়ে এই কথাগুলো বললেই আমি শিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতে তোমার চাকরি আর বিয়ের তদ্বির করতে ছুটব। আগে তোমার কথা, পরে আমার কাজ। শুধু এটা মনে রেখো, এ ব্যাপারেও আর পাঁচটা ক্যান্ডিডেট আছে, তাদের মুরুব্বিও আছে। সুতরাং দেরি হয়ে গেলে—। ওই কথা শুনে দোষ স্বীকার করার জন্যে অর্ণব পরদিনই ছুটেছিল। ব্যস, তার পরের ঘটনা তো তোমার নিজের চোখে দেখা।'

'কিন্তু—।'

'অর্ণবের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর ভাইঝির বিয়ে হয়ে গেছে গত মাসেই। চাকরির খবরও পাকা। হয়তো এর মধ্যে পেয়েও গেছে চাকরি— কলকাতার ভেতরেই চাকরি। তবে তোমাকে আর একটা কথা বলি। এত দিন বলা নিষেধ ছিল বলেই বলিনি।'

আর একবার অবাক হল নন্দিনী। 'কী কথা?'

'এই যে এত মতলব ভাঁজা, এ কিন্তু আমার একার দ্বারা হত না। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত উনিই সব পরামর্শ দিয়েছেন।'

'কে?'

'চিত্ততোষবাবু।'

'তিনি আবার কে?'

'চিত্ততোষ চক্রবর্তী। তোমার চিত্তকাকু।'

চোখ বড়-বড় করে নন্দিনী বলল, 'চিত্তকাকু সব জানতেন?'

'আমিই যোগাযোগ করেছিলাম। আজ নয়, পাঁচ-ছ মাস আগে। উনি তোমাকে খুব ভালবাসেন, সেই সুবাদে আমিও ওঁর স্নেহ পেয়েছি· সোজা পথে তোমার বাবাকে বাগ মানানো যাবে না। উনি অনেক চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। শেষে বললেন— 'এবার একটু বাঁকা পথ ধরতে হবে। বাঁকা পথ ধরব বললেই তো সেই পথ পাওয়া যায় না। একদিন কথায় কথায় মন্ত্রীর ওই ভাইঝির বিয়ের কথা বলেছিলাম। অমনি উনি হাততালি দিয়ে বলে উঠেছিলেন, এটাকেই ক্যাশ করতে হবে।'

'যাহ্! এ ভাবে কথা বলেন না চিত্তকাকু।'

'তোমার সঙ্গে বলেন না। আমার সঙ্গে বলেন। তারপরেই মাস্টার প্ল্যান ছকে ফেলেছিলেন। যেমন-যেমন ভাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন, আমি ঠিক তেমন-তেমন ভাবে এগিয়েছিলাম। ব্যস, তারপরেই কেল্লা ফতে।'

সব শুনে চিত্তকাকুর ওপর নন্দিনীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল।

কিছুক্ষণ বাদে আবার অর্ণবের কথা তুলল সাত্যকি। 'ব্যাপারটা কিন্তু সব দিক থেকেই

ভাল হয়েছে। আমরা ভাল আছি, ওদিকে ওই অর্ণবও দিব্যি আছে। মন্ত্রীর ভাইঝি বউ। ভাল একটা কলেজে চাকরিও হয়ে গেছে। বেশ বড়সড় একটা ফ্ল্যাটও ভাড়া নিয়েছে নাকতলার দিকে। যাবে নাকি একদিন ওদের বাড়িতে?'

বিরক্ত হয়ে নন্দিনী জবাব দিল, 'বয়ে গেছে আমার ওর বাড়িতে যেতে।'

'এ ভাবে বলছ কেন? একটা সময় ও তো তোমার প্রিয় বন্ধু ছিল।'

'কচু প্রিয় বন্ধু।'

'এটা তোমার অভিমানের কথা। একদিন চলো না নিজের চোখে দেখে আসবে ওদের নতুন সংসার।'

রীতিমত চটে উঠে নন্দিনী বলল, 'দেখার হলে তুমি দেখে এসো। একেবারে বাজে ছেলে। খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছি।'

অবাক হয়ে সাত্যকি জিজ্ঞেস করল, 'কে বেঁচে গিয়েছে?'

'কে আবার, আমি।'

'কেন?'

'তুমি না থাকলে, আর—।'

'আর?'

'বাবা চাপাচাপি করলে ওই বাজে ছেলেটাকেই বিয়ে করতে হত আমাকে। কী আমার বোধিসত্ত্বরে—! খুব জোর বেঁচে গিয়েছি।'

মৃদু হেসে সাত্যকি নন্দিনীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'শুধু তুমিই বাঁচোনি, আমাকেও বাঁচিয়ে দিয়েছ।'

মাঝরাত। মেঝের ওপর চাঁদের আলোর যে ফালিটা পড়েছিল, সেটা এখন বিছানায়—ঠিক ওদের গায়ের ওপর।

সত্যকাহিনী

টানা দুদিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। কখনও খুব জোরে কখনও আস্তে; কিন্তু একবারের জন্যেও ধরেনি। সম্পাদকের দফতর। টেবিলের এপাশে পত্রিকার সম্পাদক সত্যসুন্দর, ওপাশে পত্রিকার লেখক বিনায়ক পাল। বিচ্ছিরি বৃষ্টি, স্যাঁতসেতে আবহাওয়া দুজনকেই কেমন যেন মিইয়ে দিয়েছিল। দুজনেই একটু আগে কালো কফি আর পকৌড়া খেয়েছেন। গরম পকৌড়ায় কুচো লঙ্কার পরিমাণ একটু বেশি ছিল, ওই রকম পকৌড়ার সঙ্গে গরম কফি খেলে শরীর মন বেশ একটু চাঙ্গা হওয়ার কথা। কিন্তু তা হল না।

জানলার বাইরে ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি। ভরদুপুরেই রাস্তায় সন্ধের অন্ধকার নেমেছে। ওদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে সত্যসুন্দর বললেন, 'জীবনটা কাটাতে চেয়েছিলাম এক ভাবে, কেটে গেল আর এক ভাবে। দেশ যখন স্বাধীন হল তখন আমি ক্লাস টেনে পড়ি। কত হবে, বছর ষোলো বয়েস। ওই বয়েসটা ছিল স্বপ্ন দেখার বয়েস। আমরা স্বপ্ন দেখতাম, দেশ স্বাধীন হলেই দেশের সব দুঃখ ঘুচে যাবে। দেশের জন্যে কম লোক তো প্রাণ দেয়নি। চতুর্দিকে আদর্শবাদী মানুষ। এখন তো আমার হেঁড়ে গলা, কিন্তু ওই বয়েসে আমার গানের গলা খুব মিষ্টি ছিল। দাদারা মিটিং করত, আমি মিটিংয়ের শুরুতে গান গাইতাম। সব স্বদেশী গান। কী-সব গান, কী-সব সুর! গাইতে গাইতে রোমাঞ্চ হত। আর শ্রোতাদের সে কী উদ্দীপনা! তখনকার নেতারা ছিলেন সত্যিকারের নেতা। ফাঁসির দড়ির দিকে পা বাড়িয়ে রেখে দেশোদ্ধারের কাজ করত। বিশ্বাস করুন, সেই বয়েসে আমার প্রায়ই মনে হত— দেশের জন্যে কবে আমি প্রাণ দেব। এরকম চিন্তা শুধু একা আমার নয়, আমার বয়সী অনেক ছেলেই তখন ওই রকম ভাবত। নেতাদের কথা শুনে এমন উত্তেজনা আসত যে, কত রাত না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিয়েছি। নেতারা গলায় আবেগ ঢেলে বলতেন— দেশমাতৃকা আর নিজের মায়ের মধ্যে কোনও তফাত নেই। সেই মাকে ভিনদেশী শাসকরা শেকল পরিয়ে রেখেছে। এবার সেটা ভাঙার সময় এসেছে। আপনার কি মনে পড়ে সে সব কথা? মনে থাকার কথা নয় অবশ্য, আপনি তো আমার চাইতে বছর সাতেকের ছোট।'

সম্পাদকের স্মৃতিচারণ শুনতে শুনতে লেখকও ফিরে গিয়েছিলেন ছেলেবেলায়।

বললেন, 'দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন আমি ক্লাস টুয়ে পড়ি। কিন্তু ওই বয়েসের কয়েকটা ছবি এখনও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভাসে। আমাদের বাড়িতে সেদিন অনেক লোক এসেছিল। সবার মুখেই হাসি। বড় একটা মিষ্টির হাঁড়ি থেকে মা সবাইকে মিষ্টি তুলে দিচ্ছিলেন। আমার পরিষ্কার মনে আছে, আমি অনেকগুলো মিষ্টি খেয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু কেউ বকাবকি করেনি আমাকে। বাবার বন্ধু ছোটুকাকু আমাকে কাঁধে তুলে নেচেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারটা ওই বয়েসে বুঝিনি, বোঝার কথাও নয়। শুধু এটা মনে হয়েছিল, আমাদের সবার সব দুঃখকষ্ট ঘুচে গেছে।'

'আপনি তো সার কথাটাই বুঝেছিলেন বিনায়কবাবু। আমরাও তাই বুঝেছিলাম। আমার বয়েস আপনার চাইতে একটু বেশি বলে স্বাধীনতা নিয়ে দু-চারটে কথা বলতে পারতাম তখন। ব্যস, আর কোনও তফাত ছিল না। স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দে বুড়োরা পর্যন্ত শিশু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অবস্থাটা কী দ্রুত পালটে গেল! পালটে খারাপই হতে লাগল। এখন আমি ফেরেব্বাজ সম্পাদক। আমার কাজ হচ্ছে দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানানো। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও বেশ কিছুকাল আমি আদর্শের বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়াতাম। আপনি কি জানেন, আমি কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিলাম?'

অবাক হলেন লেখক বিনায়ক পাল। 'বহু পেশার মধ্যে গিয়েছেন আপনি, কিন্তু তার মধ্যে যে শিক্ষকতাও আছে— এটা জানতাম না তো?'

'কী করে জানবেন? আমি জানালে তবে না জানার কথা! এই সঙ্গে আরও একটা জিনিস জেনে রাখুন, নিছক জীবিকার জন্যে নয়, মানুষ গড়ার আদর্শ নিয়ে শিক্ষকতা করতে গিয়েছিলাম। এখন সেসব ভাবলে হাসি পায়। আমার মোহভঙ্গ হতে শুরু করেছিল দু-বছরের শিক্ষক-জীবনের শেষের দিক থেকেই। টের পেয়েছিলাম, আমার স্বপ্নের পৃথিবী আর সত্যিকারের পৃথিবীর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। এটা টের পাওয়ার পরেই শিক্ষকতা থেকে সরে পড়েছিলাম।'

'তার পরেই কি জুতোর ব্যবসা ধরেছিলেন?'

'না-না, জুতোর ব্যবসায় গিয়েছিলাম আরও তিনটে চাকরি করার পরে। দু-নম্বর চাকরি একটা প্রাইভেট ফার্মে ক্লার্কের। ক্লার্কের চাকরিটা গেল চুরি করার অভিযোগে।'

'চুরি!'

'হ্যাঁ, সত্যিই চুরি। তবে সেটা আমি করিনি, করেছিল ওই অফিসের ছোট সাহেব। নিজে বাঁচার জন্যে আমাকে চোর সাজাল। আমার চাকরি তখনও পাকা হয়নি। যার চাকরি কাঁচা, কিন্তু চোর হিসেবে পাকা— তার কী আর চাকরি থাকে? বড় সাহেব আমাকে ডেকে ধমকে বলল: তোমার ভাগ্য ভাল যে, তোমাকে পুলিশে দিচ্ছি না। শিগ্‌গির বিদেয় হও এখান থেকে। মুখ কালো করে চলে গেলাম আমি।'

'আপনি প্রতিবাদ করলেন না?'

'কাঁচা চাকরির লোকের কী প্রতিবাদ করা মানায়?'

'বেশ, প্রতিবাদের কথা বাদ দিলাম, কিন্তু আপনি যে নির্দোষ সেটা তো বলা উচিত ছিল আপনার।'

'আমি যে নির্দোষ, সেটা প্রমাণ করার কোনও রাস্তা ছিল না। ছোট সাহেব ঘুঁটি সাজিয়ে রেখেছিল পাকা হাতে। বড় সাহেব ছিল ভীষণ মেজাজি, তর্কাতর্কি করলে নির্ঘাত পুলিশ ডাকত। অপবাদ মাথায় করে বেরিয়ে আসা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ খোলা ছিল না আমার সামনে। তবে ওই ঠোক্কর খাওয়াটা দরকার ছিল আমার। পৃথিবীটাকে নতুন ভাবে চিনতে শুরু করেছিলাম আমি। তারপর কিছুকাল ধর্মের ষাঁড় হয়ে ঘুরে বেড়াবার পরে এক স্টোরকিপারের অ্যাসিস্ট্যান্টগিরির চাকরি করি। আমার চোখে তখনও আদর্শবাদ আর সততার ঠুলি পরানো ছিল। ওই ঠুলিটা ওই স্টোরকিপার গাঙ্গুলি প্রথম দিনেই টান মেরে খুলে দিয়েছিল।'

'কী রকম?'

'স্টোরকিপার গাঙ্গুলি ছিল মাঝবয়সী। চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম পোড়-খাওয়া ধুরন্ধর মানুষ। আমাকে ডেকে বলল, শোনো ছোকরা, এদিকে এসো। সেদিনের কথাটা পরিষ্কার মনে আছে আমার। আমাকে বলল: চাকরি পেয়েছ, ভাল কথা। কিন্তু এ চাকরি তোমার বড় জোর তিন বছরের। ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলাম: কই, আমাকে তো সে কথা বলা হয়নি। উত্তরে অদ্ভুত ধরনের হাসি হেসে গাঙ্গুলি বলেছিল: বলার কথা নয়, তাই বলেনি। কিন্তু আমি তোমার ভাল চাই বলেই বলছি। তিন বছর পরে আবার বেকার হলে কী করবে ভেবেছ? তখন চাকরির বাজার আজকের চাইতেও খারাপ হবে। তোমার বয়েস আজকের চাইতে তিন বছর বেড়ে যাবে। কী করবে তখন? গাঙ্গুলির কথাবার্তা আমার কাছে ধাঁধার মতো ঠেকেছিল! আমাকে রীতিমত ঘাবড়ে দেওয়ার পরে গাঙ্গুলি মুখ খুলেছিল আবার! এটা একটা আধা-সরকারি সংস্থা। শুরু থেকে লোকসানে চলছে। ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা করে। আমার কাছে খবর এসেছে, সরকার এবার এই বোঝা ঘাড় থেকে নামাবে। তবে এত বড় প্রতিষ্ঠানের ঝাঁপ তো আর রাতারাতি বন্ধ করা যায় না, সেই জন্যেই বছর-তিনেক সময় লেগে যাবে। তিন বছর বাদে তুমিও বেকার, আমিও বেকার। এবার মাথা খাটিয়ে তুমি বলো তো— এখন আমাদের কর্তব্য কী?'

'কী বললেন আপনি?'

'কী বলব আবার! আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। প্রথম দিন জয়েন করেই কী বিদ্‌ঘুটে কথা শুনছি! গাঙ্গুলি আমার চেহারা দেখে বেশ একচোট হেসে নেওয়ার পরে বলেছিল: কর্তব্যকর্ম আমাদের একটাই। আখের গুছিয়ে নেওয়া। তিন বছর পরে এই কোম্পানির সবাই বেকার হবে— সেই কথাটা এখন থেকেই ভাবা উচিত। অসময়ের জন্যে পশুপাখিও খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে, মানুষ হয়েও সেটা যদি আমরা না করি— প্রচণ্ড ভুগতে হবে কিন্তু। তিন বছর বাদে বেকার হওয়ার পরেও যাতে আমরা বিপদে না পড়ি— সে ব্যবস্থা এখন থেকেই করতে হবে।'

'আপনার ওই গাঙ্গুলি কি লাইফ ইনসিওরেন্সের পার্ট-টাইম এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন?'

হেসে উঠলেন প্রবীণ সম্পাদক সত্যসুন্দর গোস্বামী। 'শুনুন না। আমাকে প্রচণ্ড ঘাবড়ে দেওয়ার পরে গাঙ্গুলি বলেছিল: এই কোম্পানিতে যাদের মাথা খুব সাফ— তারা ভবিষ্যতের

কথা ভেবে দু-হাতে লুটেপুটে নিচ্ছে। আমার মাথাও সাফ— আমিও ওই লাইনেই আছি। বুঝতে পারছি তোমার দ্বারা চুরি-ফুরি হবে না গোড়ায়-গোড়ায়। প্রথম দিকে তুমি শুধু চোখ বুজে থাকবে। চোখ বোজার জন্যে কমিশন পাবে। তারপর একটু সাহস বাড়লে আমার কাজে হাত লাগাবে। তার জন্যে মোটা টাকা পাবে। ওই টাকার একটা অংশ ওড়াও, ফুর্তিফার্তা করো। বাকিটা জমাও অসময়ের জন্যে। কী ভাবে টাকা জমাতে হবে পরে আমি বলে দেব।'

'বলল! প্রথম দিনেই মুখের ওপর এই ভাবে বলল! আপনি কী বললেন তখন?'

'কিছুই বললাম না। একটুখানি ঘাড় নেড়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলাম। আমি তখন মার-খাওয়া মানুষ। চুরি না করেও চুরির অপরাধে চাকরি খুইয়েছি। চাকরির প্রথম দিনেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, চুরির ব্যাপারে গাঙ্গুলিকে মদত দিতে না পারলে চাকরিটা খোয়াব। ওই গাঙ্গুলিই আমাকে গড়েপিটে নিয়েছিল। ওর প্রথম উপদেশটা আজও মনে আছে আমার। বলেছিল: তোমার মাথার ভেতরে যদি আদর্শ-ফাদর্শের বুলি থাকে, ওগুলো বার করে শিকেয় ঝুলিয়ে রাখো। তারপর ভেবে নাও— যে দেশের যে আচার, সেই আচারই মানতে হবে তোমাকে। পৃথিবীটা পুরো গোল নয়, তেরছা। তেরছা চোখে সব কিছুর দিকে তাকাতে হবে। ট্যারাব্যাঁকা কাজ করতে হবে। যদি সেটা করতে পারো, তুমি টিকছ, না হলে স্রেফ হাওয়া হয়ে যাবে।'

'আপনি কী বললেন?'

'কিছুই না। শুধু এটা টের পেয়েছিলাম— আমার জ্ঞানচক্ষু খুলতে শুরু করেছে। ভেতরের জ্ঞানচক্ষু যত খুলতে লাগল ততই আমি বাইরের চোখ বুজে থাকতে লাগলাম। গাঙ্গুলির কারচুপি দেখেও দেখতাম না। ও নিয়ে কারও কাছে মুখও খুলতাম না। তার ফল কী হল বলুন তো?'

'কী?'

'মাস-তিনেক পর থেকে আমি দুদিক থেকে মাইনে পেতে লাগলাম। একটা কোম্পানির কাছ থেকে, আর একটা গাঙ্গুলির কাছ থেকে। চোখ বুজে থাকার জন্যে গাঙ্গুলি আমার পিঠ চাপড়ে দিত। একদিন ওই গাঙ্গুলিই আমাকে মদ খাওয়াতে নিয়ে গেল। সেই আমার প্রথম মদ খাওয়া। বলল: এটা খাবে। খেলে কী হয় জানো? আমি জিজ্ঞেস করলাম— কী? গাঙ্গুলি বলল: মনে জোর বাড়ে, বুকে সাহস আসে। এবার থেকে তুমি অনেক বেশি টাকা পাবে। তবে এবার আর চোখ বুজে থাকার জন্যে নয়, চোখ খুলে রেখে আমাকে সাহায্য করার জন্যে।'

'সাহায্যের হাত বাড়ালেন?'

'অবশ্যই। ধীরে ধীরে গাঙ্গুলির আদর্শই আমার আদর্শ হয়ে উঠল। গাঙ্গুলি বলত: দেখো, আমরা যে কারচুপি করছি, সেই মাথা খাটাবার একটা দাম আছে তো? আমরা তো আর বিধবার সম্পত্তি গ্রাস করছি না। কার কাছ থেকে দুটো পয়সা নিচ্ছি? না, সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে। আমরা না নিলে সরকারের টাকা যে জমত— তা নয়। আমাদের বদলে আর কেউ-কেউ নিত। পার্টির কাছে টাকা নিই। কিন্তু নিয়ে তাদের কাজটা তো তুলে দিই।

আমরা না তুলে দিলে আইন আর ফাইল চালাচালির মারপ্যাঁচে পার্টির প্রাপ্য টাকা তামাদি হয়ে যেত। আমরা পার্টির কাজ করে দিলাম, আবার বাড়তি দুটো পয়সা পেলাম। একেই বলে— সার্ভিস টু দ্য নেশন। পরিষ্কার মাথা ছিল গাঙ্গুলির। কোথাও কোনও অস্পষ্টতা নেই। খাটতেও পারত সেই রকম। খাটা আর দু-হাতে টাকা লোটা। তবে লোকটাকে সৎ বলব— আমার পাওনা দু-নম্বরী টাকা থেকে একটা টাকাও সরায়নি কখনও। লোকটার কথা যে বেদবাক্য— তার প্রমাণ পেলাম তিন বছর বাদে। ঠিক তিন বছর বাদে আমাদের ওই আধা-সরকারি কোম্পানি পাহাড় প্রমাণ লোকসানের বোঝা আর টানতে না পেরে উঠে গেল। গাঙ্গুলিকে প্রণাম করে বললাম: আপনার কাছে কাজ করতে না এলে আজ আমাকে না খেয়ে মরতে হত। আপনি পাশে দাঁড়িয়ে সব সময় সুপরামর্শ না দিলে আমি বিপদের দিনের জন্যে নিজেকে একটু তৈরি করে রাখতে পারতাম না। বাড়তি রোজগারের যে টাকাটা জমিয়েছি সেই টাকায় দুটো বছর দিব্যি চলে যাবে। এই দু বছরের মধ্যে আর একটা রোজগারের ধান্দা মনে হয় হয়ে যাবে।'

'তার উত্তরে কী বলেছিল গাঙ্গুলি?'

এক গাল হেসে সম্পাদক সত্যসুন্দর বললেন, 'লাখ কথার এক কথা। ও কথাটা আমি কখনও ভুলিনি, কখনও ভুলব না। বলেছিল: কারও কাছ থেকে যদি কখনও পয়সা খাও, তার কাজটা অবশ্যই করে দেবে। টাকা খেলে অথচ তার কাজ করে দিলে না— এমন অন্যায় যেন কখনও না হয়।'

লেখক বিনায়ক পাল তারিফ করার গলায় বললেন, 'এমন একটা দামি কথা আপনি আমাকে আগে শোনাননি কেন? একজন সৎ ঘুষখোরকে নিয়ে আমার একটা বড় উপন্যাস লেখার ইচ্ছে আছে অনেক দিন ধরে। যদি কখনও লিখি গাঙ্গুলির এই কথাটাই হবে আমার ওই উপন্যাসের বীজমন্ত্র। ঘুষখোররা কত লোকের কত উপকার করে দেয়। কত লোককে বিপদ থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু তার কী মন্দভাগ্য দেখুন। যারা ঘুষ দিয়ে কাজ উদ্ধার করেছে, তারাই ঘুষখোরকে বেশি গালাগালি দেয়। তবে আপনার কপাল ভাল সত্যসুন্দরবাবু, আপনি আপনার প্রথম জীবনেই ওই গাঙ্গুলির মতো আদর্শ একজন গাইড পেয়ে গিয়েছিলেন। আমি পাইনি, তার জন্যে পদে পদে মার খেতে হয়েছে। প্রথম জীবনে আমি ছিলাম একজন লাজুক কবি। কাউকে ল্যাং মারার কথা স্বপ্নেও ভাবতাম না। টাকাপয়সার প্রতি বিন্দুমাত্র ছোঁক-ছোকানি ছিল না। অল্পে তুষ্ট ব্যক্তি বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই ছিলাম। নিজের মনে রাত জেগে জেগে কবিতা লিখতাম। কবিতা ছিল আমার মনের দুর্বলতম স্থান। সম্পাদক আর প্রকাশক সেই জায়গাটায় বেধড়ক খোঁচা মেরে গেছে দিনের পর দিন। রাগে-দুঃখে ঘেন্নায় শেষে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে বানানো সত্যকাহিনীর লেখক হয়ে গেলাম। তখন ওই প্রকাশক, সম্পাদকরাই আমার দরজায় ধর্না দিয়ে বসে থাকত। প্রত্যেকেরই হাতে-গরম রগরগে সত্যকাহিনী চাই। কিন্তু রক্ত জল করে লেখা একটা কবিতা ওরা ছুঁয়েও দেখবে না। কেন? না, ওরা নাকি কবিতা বোঝে না। আরে, তোরা বানানো সত্যকাহিনীও বুঝিস না। একটা আগাগোড়া মিথ্যে ব্যাপারকে সম্পূর্ণ সত্যকাহিনী হিসেবে দাঁড় করাতে গেলে কতখানি কল্পনাশক্তি খরচ করতে হয়— সেটা তোরা বুঝিস? আমি তো সব ক'টাকে

ভাগিয়ে দিয়ে বলেছি— সমঝদার সম্পাদক বলতে একজনই আছে— তার নাম সত্যসুন্দর গোস্বামী।'

সম্পাদক সত্যসুন্দর বিব্রত হয়ে বললেন, 'থাক-থাক্, ও-কথা থাক। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন? সম্পাদক আর লেখকের সুর যদি এক তারে বাঁধা থাকে, তাহলে ব্যাপারটা জমে যায়। তা না হলেই বিপদ। আমাদের দুজনের মধ্যে চমৎকার একটা সমঝোতা আছে, এটা আমাদের দুজনের পক্ষেই লাভ। আর সব চেয়ে বেশি লাভ পাঠকদের।

ঘ্যানঘ্যানানি বৃষ্টি আর ধরেনি। নতুন আর পুরনো সুখদুঃখের কথা বলতে বলতেই গোটা দিনটা কেটে গেল লেখক আর সম্পাদকের।

।। দুই ।।

পরের দিন সকাল থেকেই আকাশে ঝকঝকে রোদ। 'সদা সত্যকাহিনী'র ধুরন্ধর সম্পাদক সত্যসুন্দর গোস্বামীর ঘরে আজ আর গতকালের মতো স্মৃতিচারণ নয়। সব কথাই কাজের কথা।

উলটো দিকের চেয়ারে সত্যকাহিনীর ডাকসাঁইটে পেশাদার লেখক বিনায়ক পাল। 'সদা সত্যকাহিনী' পত্রিকার বেশির ভাগ কভার-স্টোরি এঁরই। বানানো সত্যকাহিনী, কিন্তু এমন চমৎকার ভাবে লেখা যে কারও পক্ষে বোঝার উপায় থাকে না— এটা একেবারে গালগল্প।

লেখককে অধিকাংশ কভার-স্টোরির আইডিয়া দেন সম্পাদক। লেখক সেই আইডিয়াটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে-মজিয়ে-রসিয়ে মাত করে দেন। ওই কভার-স্টোরি পড়ার জন্যে মুখিয়ে থাকে পাঠকরা। আর গোগ্রাসে পড়ার পরে ধরতে গেলে সবাই চোখ কপালে তুলে বলে থাকে: সত্যি, মানুষের জীবনে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে থাকে!

পরের সংখ্যার কভার-স্টোরির একটা ভাবনা সত্যসুন্দরের মাথায় খেলে গিয়েছিল। উনি বিনায়কের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাই বলুন আর তাই বলুন, মানুষের মধ্যে কিন্তু জন্তুর স্বভাবটাই রয়ে গেছে বেশি পরিমাণে। থাকার কারণও আছে। খুব সোজা একটা হিসেব দিচ্ছি আপনাকে। মানুষের পূর্বপুরুষ তো বাঁদর। সেই বাঁদর সোজা হয়ে হাঁটতে শিখেছিল আজ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে। কুড়ি লক্ষ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষের চেহারা ছিল অনেকটা শিম্পাঞ্জির মতো। লেজ-খসা আদিম মানুষ প্রথম গ্রাম তৈরি করে আজ থেকে মাত্র দশ হাজার বছর আগে। যতই সভ্যতা-সভ্যতা বলে চেঁচাই না কেন, আমরা সভ্য হলাম এই তো সেদিন। লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে বাঁদর ছিলাম, তাই বাঁদরামি কি রাতারাতি ঘুচে যাবে! একটু রেখেঢেকে ভদ্র ভাষায় মানুষকে র‍্যাশানাল অ্যানিম্যাল বলা হয়। আদতে মানুষের মধ্যে জন্তুর ভাবটা ষোলো আনার মধ্যে বারো আনা। এই তো সেদিনও রাজা-মহারাজারা সিংহ দিয়ে মানুষ খাওয়ানোর খেলা দেখত। মুঘল বাদশারা দুর্গের মাথায় বসে নীচের ঘেরা জায়গায় ক্ষুধার্ত বাঘ-সিংহের লড়াই দেখত। একটা প্রাণী না মরা পর্যন্ত সে লড়াই থামত না। এই ধরনের লড়াই দেখে আনন্দ পাওয়াকে পাশবিক

আনন্দ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে!'

প্রায় এক দমে কথাগুলো বলে ফেলার পরে সম্পাদক সত্যসুন্দর মুখের মধ্যে একটা পান গুঁজে দিলেন। তারপর ওই পানের মধ্যে কিছুটা জর্দা চালান করে দেওয়ার পরে চোখ বুজে জাবর কাটতে লাগলেন।

লেখক বিনায়ক জানেন, সম্পাদকের এই ভাবে জাবর কাটার সময়টি খুব মূল্যবান। পানের মধ্যে জর্দা একটু মজে গেলে গোটাকয়েক হেঁচকি উঠবে সম্পাদকের। এক-একটা হেঁচকি মানেই এক-একটা অভিনব আইডিয়া। লেখকের কাজ হল ওই আইডিয়া নিয়ে গপ্পো বানিয়ে সত্যকাহিনীর কভার-স্টোরি বানানো। সম্পাদক অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। প্রায়ই বলেন, যে কাহিনী যত বেশি গাঁজাখুরি, সত্যকাহিনীর বাজারে তার তত বেশি চাহিদা।

সম্পাদকের ওই কথাগুলো যে কত সত্যি, লেখক বিনায়ক পাল তা বহু ভাবে জেনে গেছেন। প্রতি সোমবার শহরের পত্রিকার স্টলে তাড়া-তাড়া সত্যকাহিনী পড়ে, মঙ্গল-বুধের মধ্যেই বিক্রিবাটা শেষ। বাসে-ট্রামে নিজের বানানো সত্যকাহিনীর তারিফ অচেনা পাঠকের মুখে শুনে লেখকের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে কতবার। আগে নির্জলা মিথ্যেকে খাঁটি সত্যি বলে মেনে নিতে ওঁর একটু বাধো-বাধো ঠেকত, এখন আর তা হয় না। সম্পাদক গল্প-বীজের জোগান দেন আর লেখক তার থেকে ফসল ফলান। পত্রিকা হু-হু করে বিক্রি হওয়া মানে মালিক, সম্পাদক আর লেখকের পকেটে মোটা টাকা আসা। দিব্যি সুখে কাটছে সত্যকাহিনীর সংসার।

এই সত্যকাহিনী পত্রিকাটির পুরো নাম 'সদা সত্যকাহিনী'। কিন্তু 'সদা' শব্দটা মলাটের মাথার দিকে ছোট্ট করে লেখা থাকে। নীচে মস্ত বাহারি হরফে 'সত্যকাহিনী'। আসলে 'সত্যকাহিনী' নামে এক সময় একটি পত্রিকা ছিল বলে ওই নামে রেজিস্ট্রেশন মেলেনি। নিরুপায় হয়ে সত্যকাহিনীর আগে 'সদা' বসাতে হয়েছে। কিন্তু পত্রিকার মলাটে এটি এতই ছোট যে চোখে পড়ে না। ক্রেতা, বিক্রেতা আর পাঠকের মুখে নাম হিসেবে শুধু সত্যকাহিনীই ফেরে। পরে সম্পাদক ভরাট গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, পরের সংখ্যার কভার স্টোরির কথা কিছু ভাবলেন?'

লাজুক মুখে জবাব দিলেন লেখক, 'আপনি থাকতে আমি আর শুধু-শুধু ভাবাভাবির মধ্যে যাব কেন? আপনি মসলার জোগান দেবেন, আমি শুধু বানিয়ে দিয়েই খালাস।'

লেখকের সত্যভাষণ শুনে সত্যকাহিনীর সম্পাদকের মুখে সুন্দর একটা হাসি ফুটে উঠেছিল। আর একটা হেঁচকি ওঠার পরে আবার মুখ খুললেন উনি। 'এবারের সত্যকাহিনীর সেটিংটা দেশের মধ্যে না রেখে একটু বরং বাইরে নিয়ে যাওয়া যাক। এই ধরুন আফগানিস্তান। সত্যকাহিনী বানাতে হবে কাবুল কিংবা কান্দাহারের পটভূমিকায়। কাহিনীর মধ্যে ফল বেচা, তুলোচাষ আর ভেড়া চরানো থাকবে। মাঝেমধ্যে হিন্দুকুশের প্রসঙ্গ টেনে আনতে পারলে খারাপ হবে না। তালিবানদের লড়াইয়ের কথা তুলতে হবে দু-চারবার। সত্যকাহিনী ফাঁদুন একটা শক্তসমর্থ ধনী বুড়োকে নিয়ে। লোকটা কার্পেট আর লাপিস লাজুলি বেচে বহু কোটি টাকা কামিয়েছে। ব্যাটা এক নম্বরের পারভার্ট। জঘন্য সব মজা লোটার জন্যে দুহাতে টাকা ওড়ায়। এর শিকার একটি মেয়ের জবানবন্দি থেকে আপনার

এবারের সত্যকাহিনীটা ফাঁদতে হবে। কাবুলের সেটিং পছন্দ না হলে বাহ্‌রিনে চলে যান কিংবা ব্রুনেইতে। ব্রুনেই হলে অবশ্য কাহিনীর মধ্যে সুলতানকে একবার আনতে হবে। কিংবা—।'

'না-না, কাবুল-কান্দাহারই থাক।'

'কেন, কাবুল-কান্দাহার চাইছেন কেন?'

'ওই যে হিন্দুকুশের কথা বললেন না—। ওটা শুনেই স্কুলে-পড়া হিন্দুকুশ পর্বতমালার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আমার—।'

'বাহ্! চমৎকার! দরকার হলে সত্যকাহিনীর মধ্যে স্কুল-পড়ুয়া একটা চরিত্রকেও ঢুকিয়ে দিতে পারেন।'

'কিন্তু আপনার গল্পটা কী?'

মুখের মধ্যে আবার এক টিপ জর্দা ফেললেন সত্যসুন্দরবাবু। কিছুক্ষণ জাবর কাটার পরে যে হেঁচকিটা তুললেন সেটা বেশ বড়সড়। চোখ বুজে এসেছে প্রায়। মাথার পাতলা চুলের মধ্যে দু-চারবার আঙুল চালিয়ে নিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'ওই যে মানুষের পাশবিক আনন্দের কথা বলছিলাম— ওটাকেই এবারের সত্যকাহিনীর বিষয় করে দিন। বুড়ো পারভার্টের কথা বলছিলাম না— ওই হবে কাহিনীর প্রধান চরিত্র। টাকার কুমির, বিদঘুটে মজা পাওয়ার জন্য ভয়ংকর সব কাণ্ডকারখানা করায়। এইখানে আপনার কল্পনাশক্তিকে একেবারে লাগামছাড়া করে দিন। পাঠক পড়বে আর শিউরে-শিউরে উঠবে, কিন্তু পড়া শেষ না করা পর্যন্ত থামতে পারবে না। মধু খেতে এলে মাছির দশা যেমন হয়, ঠিক তেমন দশা হবে পাঠকদের। সেই পুরনো আমলের একটা হারেম বানিয়ে দিন বুড়োটার। একগাদা বউ, একগাদা রক্ষিতা। বহু কোটি টাকার মালিক, টাকার মা-বাপ নেই; দেশবিদেশ থেকে সুন্দরী সংগ্রহে তাই অকাতরে খরচা করে। সুন্দরী সংগ্রহের তিনটে রাস্তা। এক, টাকার লোভ দেখিয়ে। দুই, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে— যাকে বলে ফুসলে আনা। তিন— ওই দুটো পথে কাজ না হলে অপহরণ। ঠিক আছে?'

'ঠিক—।'

'আপনার এবারের সত্যকাহিনী কিন্তু হারেমের লীলাখেলার মধ্যে যাবে না। একটা অন্য অ্যাঙ্গেলে আনতে হবে।'

'কী রকম?'

'আমি শুনেছি কিছু-কিছু ঘোড়াকে নাকি মেটিংয়ের আগে সেক্স সিরাম খাওয়ানো হয়। আপনি শুনেছেন?'

প্রশ্নের উত্তরে লেখক বিহ্বল ভঙ্গিতে যে ভাবে মাথা নাড়ালেন— তার একটাই অর্থ। নাহ্! বাপের জন্মে শুনিনি!

লেখকের প্রতিক্রিয়া দেখে সম্পাদক খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। 'আপনি সত্যকাহিনীর পাকা লেখক, আপনি যখন শোনেননি— ব্যাপারটা নির্ঘাত জমে যাবে। ওই পারভার্ট বুড়োটা- -।'

মুখের মধ্যে আর একটা পান চালান করে তার ওপর বেশ কিছুটা জর্দা ছড়িয়ে দিয়ে

আবার জাবর কাটতে শুরু করলেন সম্পাদক। তারপর দ্রুত দু-তিনটে হেঁচকি তোলার পরে আগের কথার জের টানলেন— 'ওই পারভার্ট বুড়োটা একেবারে বখে-যাওয়া কয়েকটা ছোকরা জোগাড় করে ওই ঘোড়ায় খাওয়ার সেক্স সিরাম খাইয়ে দিল—।'

'অ্যাঁ!'

'অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। খাওয়াল। তারপর ওর হারেমের অল্পবয়সী এক সুন্দরীকে একটা ঘরে পুরে সেক্স-সিরাম-খাওয়া বখা ছোকরাগুলোকে ছেড়ে দিল—।'

আর একবার আঁতকে উঠলেন লেখক। 'আপনি কি মানুষ!'

'অবশ্যই। তবে ষোলো আনার মধ্যে মাত্র চার আনা। বাকিটা জন্তু। আমি একা নই, আমি আপনি— সবাই। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই এই রেশিওতে র‍্যাশানাল অ্যানিমাল। বলছিলাম না, আজ থেকে মাত্র দশ হাজার বছর আগে লেজ-খসা মানুষ প্রথম ঘর বাঁধতে শেখে। আর লেজওয়ালা পূর্বপুরুষ বাঁদরের চেহারায় আমাদের কেটে গেছে পঞ্চাশ লক্ষ বছর। জন্তুর স্বভাব কী করে এত তাড়াতাড়ি মুছে যাবে?'

লেখক বিচলিত হয়ে টেবিলের চারদিকে তাকালেন। বোধহয় জলের খোঁজ করছিলেন, কিন্তু না, কোথাও জল নেই।

সম্পাদক সত্যসুন্দরের আধবোজা চোখ এখন পুরো খুলে গেছে। চেয়ারের পিঠ থেকে নিজের পিঠ তুলে নিয়ে টানটান হয়ে বসেছেন। আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিটাই বলে দিচ্ছিল— সামনের সংখ্যার কভার-স্টোরির পুরো মসলাটাই ওঁর মাথায় এসে গেছে।

শুকনো মুখে একটা ঢোক গিলে লেখক বললেন, 'ওই বখাটে ছোকরাগুলো ওইসব খেয়েটেয়ে মেয়েটার ওপর নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে— এই ঘটনাটার দু-তিন পাতা বর্ণনা দিতে হবে তো?'

'না-না, টানা বর্ণনা নয়। আপনাকে জোর দিতে হবে প্রতিক্রিয়ার ওপর।'

'প্রতিক্রিয়া! কার?'

'ওই বুড়ো লম্পটটার। বুড়োটা অত খরচাপত্তর করে ওই ধরনের জঘন্য একটা কাণ্ড ঘটাচ্ছে কেন?'

'কেন?'

'ওর বিকৃত লালসা চরিতার্থ করার জন্যে।'

'কীরকম?'

'যে ঘরে ওই কাণ্ডটা ঘটবে সেই ঘরের জোরালো আলোর পেছনে লুকনো একটা জানলা থাকবে, সেই জানলা দিয়ে বুড়ো সব দেখবে—।'

সত্যকাহিনীর লেখক এককালে প্রেম, ফুল, পাখি, লতাপাতা নিয়ে কবিতা লিখতেন। ওঁর সেই শুদ্ধ কবি মন এখনও মাঝেমধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এখন যেমন। শুকনো গলায় লেখক বললেন, 'এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না?'

'কিছু বাড়াবাড়ি নয়। মুঘল বাদশারা দুর্গের মাথায় বসে নীচের ঘেরা জায়গায় বাঘ-সিংহের লড়াই দেখত না? কিংবা সিংহকে দিয়ে ক্রীতদাস খাওয়ানো? একটু রকমফেরে লম্পট বুড়োর এই কাণ্ডটা ওই রকমই—।'

'কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালি পাঠকদের পক্ষে ব্যাপারটা খুব শকিং হবে না?'

'সেটাই তো চাই আমি। ঘটনা যত শকিং হবে পত্রিকার বিক্রি তত বাড়বে। বাঙালি হোক, বিহারি হোক কিংবা সাহেব হোক— সবাই শক্‌ড হতে ভালবাসে। সুস্থ মানুষ সব চাইতে বেশি ভালবাসে অসুস্থতার গল্প শুনতে। না হলে সত্যকাহিনীর ছাপ মারা এই সব বানানো গপ্পো এত বিক্রি হত না। কী, আমি কি ভুল বলছি?'

সম্পাদকের প্রশ্নের জবাবে বাধ্য ছেলের ভঙ্গিতে দুদিকে মাথা নাড়ালেন লেখক।

ঘরের জানলা দিয়ে এক চিলতে আকাশ দেখা যায়। সেই আকাশটা দেখে নিয়ে সম্পাদক বললেন, 'মেয়েটির ওই গ্যাং-রেপের দৃশ্যটা বুড়োটা শুধু দেখবেই না, ভি সি আরও করাবে।'

'কেন, ভিডিও করাবে কেন?'

'বারে, নিজের মহান কীর্তির রেকর্ড রাখবে না! অবসর সময়ে নিজে দেখবে, গেস্টদের এনটারটেন করবে। বুড়োর পেয়ারের অতিথিরা বুড়োর স্বভাবেরই হবে। যাকে বলে রতনে রতন চেনে, শুয়োরে চেনে—। আচ্ছা, শুয়োররা কি সত্যিই কচু খুব পছন্দ করে?'

লেখক বিনায়ক পালের চোখেমুখে অন্যমনস্ক হওয়ার ছাপ ধরেছে। জহুরি সম্পাদক সত্যসুন্দর এই ছাপের রহস্য জানেন। বুঝতে পারলেন, ওঁর দেওয়া সত্যকাহিনীর বীজ লেখকের মাথার মধ্যে বেশ ভাল ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সত্যকাহিনী-লেখকটির কল্পনাশক্তি খুব প্রখর। একটু বাদেই ফুলেফেঁপে ওঠা গল্পের বীজে সবুজ পাতার ঝিলিক দেখা যাবে। সম্পাদক লেখকের মনঃসংযোগ নষ্ট না করার জন্যে তড়িঘড়ি করে নিজের কথার উত্তর নিজেই দিলেন, 'যাকগে, শুয়োর কচু পছন্দ করে না ওল পছন্দ করে সে শুয়োরেরই ব্যাপার, আমাদের কী? আপনি আর সময় নষ্ট না করে চটপট ওটা লিখতে শুরু করে দিন। এবারের সত্যকাহিনীটা মনে হচ্ছে মাপে একটু বড় হবে। না?'

।। তিন ।।

টলস্টয়ের একটি বিখ্যাত গল্প আছে। গল্পের নাম — 'ঈশ্বর সত্যকে দেখেন, তবে একটু দেরিতে।' গল্পের সেই সত্য হল আসল সত্য। নকল সত্যকাহিনীর ব্যাপারে নিয়মটা একেবারে উলটো। এখানে সত্য মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়।

সত্যকাহিনীর লেখক বিনায়ক পালের কাজের মধ্যে পেশাদারিত্ব এসে গেছে পুরোদস্তুর। মাত্র তিন দিনের মধ্যে 'সদা সত্যকাহিনী'র সুদীর্ঘ কভার-স্টোরি লিখে ফেললেন।

লেখককে এখন একটু ক্লান্ত কিন্তু বেশ পরিতৃপ্ত দেখাচ্ছে। পাণ্ডুলিপির তাড়া সম্পাদকের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'নিন, একবার পড়ে দেখুন।'

সম্পাদক এক হাত বাড়িয়ে পাণ্ডুলিপি নিলেন, অন্য হাতে টেবিলের ঘণ্টা বাজালেন। খাস বেয়ারা ঘরে ঢুকতেই ভারিক্কি চালে আদেশ দিলেন, 'শিগ্‌গির এটা নিয়ে গিয়ে কম্পোজিংয়ে ধরিয়ে দাও। বলবে— সবার আগে চাই।'

পাণ্ডুলিপি নিয়ে বেয়ারা ঘর থেকে বেরুতেই সম্পাদক সত্যসুন্দর বললেন, এ সংখ্যাটা

একটু বেশি ছাপব। এখন পড়ার জন্যে শুধু শুধু কপি আটকে রাখলাম না। পরে তো পড়বই। এখন বরং আপনার মুখ থেকে গল্পের আউটলাইনটা শুনি। বলুন তো, কী ভাবে দাঁড় করালেন এবারের সত্যকাহিনীটা!'

একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে লেখক একটু লাজুক হাসি হেসে বললেন, 'আমার সত্যকাহিনী কোথায়! এ তো আপনার। আমি শুধু জায়গায়-জায়গায় ডালপালা জুড়ে দিয়েছি।'

টেবিলের ওপর ছোট্ট একটা থাবা বসিয়ে দিয়ে সম্পাদক জবাব দিলেন, 'ডালপালা, ফুলফলই তো আসল। ন্যাড়া গাছ আর পোড়া কাঠের মধ্যে কোনও তফাত নেই। কী বানিয়েছেন, একটু শোনান তো?'

সিগারেটে আলতো করে টোকা মেরে ছাই ঝাড়লেন লেখক, তারপর সম্পাদকের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি যেমন চেয়েছিলেন তেমনই করেছি। দামি পাথর আর কার্পেট বেচে লোকটা কোটি কোটি টাকার মালিক। জীবনে একটাই শখ— তা হল ফুর্তি। এই ফুর্তিতে নীতির কোনও বালাই নেই। কিন্তু শরীরের তো ক্ষয় আছে। যৌবন তো অক্ষয় নয়। ক্ষয় শুধু একটা জিনিসেরই হয় না তার নাম আকাঙক্ষা। এই আকাঙক্ষাই বুড়োটাকে পারভার্ট বানিয়েছিল। ওর পারভারশানের বেশ কয়েকটা নমুনা দিয়েছি— কয়েকটা কিন্তু খুব বিচ্ছিরি—। যাকে বলে একেবারে গা-ঘিনঘিনে ব্যাপার।'

'তা হোক না। লোকে তো এগুলো আর বানানো গল্প হিসেবে দেখবে না। সত্যকাহিনী। গোগ্রাসে পড়ার পরে নাক সিঁটকবে, আর এটা সত্যি ব্যাপার হওয়ায় পর্নোগ্রাফি-টর্নোগ্রাফি বলে হৈ-চৈ তুলবে না। মেয়েটার গণধর্ষণের ব্যাপারটা রেখেছেন তো?'

'হ্যাঁ, ওটাই তো এই কাহিনীর ক্লাইম্যাক্স। গণধর্ষণের পরে মেয়েটা তিনদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তারপর একটু সুস্থ হওয়ার পরে হারেম থেকে পালায় রুকসানা।'

'রুকসানা কে?'

'সত্যকাহিনীর ওই ধর্ষিতার নাম দিয়েছি রুকসানা। নামটা কেমন?'

'চমৎকার।'

'রুকসানার পালাবার রুটটা প্রথমে পাকিস্তান করেছিলাম। পরে রুট পালটে দিই। দক্ষিণে পাকিস্তান, পশ্চিমে ইরান। ইরানে ঢোকালাম রুকসানাকে। কিন্তু ওকে ওখানে রাখাও নিরাপদ মনে করলাম না। উত্তরে রাশিয়া। ওখানেই নিয়ে এলাম। তারপর এশিয়ান পার্ট থেকে ইউরোপে, একেবারে মস্কোয়। লম্বা পথ। কিন্তু এই সময়টা আমি কাজে লাগিয়েছি। রুকসানা হারেম থেকে পালাবার পরেই যে ছেলেটি ওর সহায় হয় তার নাম ক্যালভিনো, ইটালিয়ান। তাসখন্দে পুরাতত্ত্ব বিভাগে কাজ করে। ছুটি কাটাতে কাবুলে গিয়েছিল। স্থানীয় ভাষা জানে। কাবুল থেকে মস্কো পৌঁছবার লম্বা পথে লম্পট বুড়োর শিকার রুকসানা ওর জীবনের ভয়ংকর সব অভিজ্ঞতার কথা শোনায় ক্যালভিনোকে। এখানে সত্যকাহিনীতে আমি একটা মানবিক লাইন এনেছি।'

'কীরকম?' বেশ আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন সম্পাদক সত্যসুন্দর।

সিগারেট নিভে গিয়েছিল লেখকের, অ্যাশট্রের মধ্যে ওটা ফেলে দিয়ে বললেন,

"রুকসানার দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে ক্যালভিনো এত সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছিল যে মস্কোতে পৌঁছেই প্রস্তাব দিল: 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই রুক্। আমি জানি, আমি তোমার যোগ্য নই। সামান্য চাকরি করি, তবে কথা দিচ্ছি— তুমি যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারো, তার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করব।"

ওই কথা শুনে অভিভূত রুকসানা অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তোমার মতো এমন মহৎ একটি ছেলের সঙ্গে ঘর বাঁধার কোনও অধিকার আমার নেই। আমি পাপীয়সী।'

'বলল?'

"হ্যাঁ, বলালাম। আচ্ছা, 'পাপীয়সী, শব্দটা কি একটু ভারী হয়ে গেল? ওটার বদলে ওখানে কি কোনও হালকা শব্দ বসাব?"

"না-না, কক্ষনো নয়। ওই কনটেক্সটে 'পাপীয়সী' শব্দটা দারুণ খাপ খেয়ে গেছে! আমি তো ভাবছি কভার স্টোরির এই জায়গাটায় 'আমি পাপীয়সী' বলে একটা সাবহেডিং দিয়ে দেব। বেশ, তারপর কী হল সুলতানার?"

'সুলতানা নয়, রুকসানা। ওই কান্নাকাটি, আদর-সোহাগের পরে ওদের বিয়ের ব্যাপারটা পাকা হয়ে গেল।'

'তা তো হল— কিন্তু এই ব্যাপারটা আমরা, মানে পাঠকরা কী করে জানব?

গোঁফের ফাঁকে হাসির ঝিলিক দেখা গেল লেখকের। 'সে জায়গা রেখেছি। সাহসী এবং আদর্শবাদী ইটালিয়ান ছেলেটা রুকসানাকে বলল: বুড়োর হারেম আর ওর অমানুষিক অত্যাচার চালানোর কথা গোটা পৃথিবীকে জানাবার জন্যে একটা প্রেস কনফারেন্স ডাকব আমি।'

'বাহ্! বিউটিফুল। প্রেস কনফারেন্স ডাকা মানেই গোটা পৃথিবী জেনে যাওয়া। ওদিকে আবার সত্যকাহিনীর শেষে মধুর মিলন— রুকসানা আর ক্যালভিনোর বিয়ে।'

'আসলে মন চাইছিল একটা হ্যাপি এন্ডিং করে দিই। ফুলের মতো মেয়েটির ওপর তো কম অত্যাচার চালানো হয়নি! শেষকালে কতগুলো বদমাইশ ছেলেকে ঘোড়ায় খাওয়ার সেক্স-সিরাম খাইয়ে ওকে গণধর্ষণ করিয়েছেন আপনি।'

'আমি! আমি কোথায়! যা করার সব তো আফগানিস্তানের ওই পাজি বুড়োটা করিয়েছে।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠে লেখক বললেন, 'সে তো এই সত্যকাহিনীর পাঠকরা জানবে। আমার জানাটা যে অন্যরকম—।'

সম্পাদক সত্যসুন্দর কিন্তু হাসলেন না। কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, 'এবারের কভার স্টোরির জবাব নেই। বিশ হাজার বেশি ছাপব।'

'এত বেশি ছাপা মানে তো মস্ত একটা ঝুঁকি নেওয়া—।'

'হোক ঝুঁকি, আমি ছাপব। আসলে পাকা সোর্স থেকে খবর পেয়েছি, আমাদের সাফল্য দেখে মধুবন গ্রূপ অব পাবলিকেশন্‌স আর একটা সত্যকাহিনী বার করার তাল করছে। ওরা যাতে পত্রিকা প্রকাশ করার সাহস না পায় তার ব্যবস্থা আমি এখন থেকেই নেব।'

।। চার ।।

সত্যসুন্দরবাবুর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। যা বলেছিলেন ঠিক তাই হল। এবারের 'সদা সত্যকাহিনী' পত্রিকার স্টলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ। যাঁরা কিনতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ সত্যকাহিনীর অফিস পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলেন। কিন্তু সম্পাদক সত্যসুন্দর প্রত্যেকের কাছেই হাতজোড় করে বলেছিলেন: 'বিশ্বাস করুন, আমাদের দফতরের জন্যে একটা ফাইল-কপি পর্যন্ত নেই। আমার নিজের কপিটাও হাতছাড়া হয়ে গেছে। এবারের সংখ্যা চল্লিশ হাজার বেশি ছাপা হয়েছে। এত চাহিদা হবে জানলে আরও বেশি ছাপাতাম—।'

কথাগুলো যেন রেকর্ড করা। একই সুরে একই ভঙ্গিতে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত শোনালেন অনেককে। লেখক সম্পাদককে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবারের সংখ্যা কি সত্যিই চল্লিশ হাজার বেশি ছাপা হয়েছিল?'

উত্তরে মুচকি হাসলেন সম্পাদক। 'পাগল! পনেরো হাজার বেশি ছাপা হয়েছে। তবে টান ছিল বেশ। আরও পাঁচ হাজার অনায়াসে ছাপা যেতে পারত।'

'পত্রিকার একটা সংখ্যাও কি দফতরে নেই!'

'কেন থাকবে না! ভেতরের ঘরে একশো ধরা আছে।'

'তবে যে বলছিলেন আপনার নিজের কপিটাও হাতছাড়া হয়ে গেছে?'

জবাবে গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন সম্পাদক।

লেখকও হাসলেন, তারপর হাসতে হাসতেই বললেন, 'আপনার একটা কথার মধ্যে তিনটে মিথ্যে! আপনি সত্যিই সত্যকাহিনীর যোগ্য সম্পাদক।'

সম্পাদকের চোখমুখ হঠাৎই কেমন যেন অন্যরকম হয়ে উঠেছিল। গলার স্বরও অন্যরকম। একটু কেটে কেটে বললেন, 'আমাদের পত্রিকার বিক্রির খবর পেয়ে নিলু তো একেবারে চুপসে গেছে।'

'নিলু কে?'

'মধুবন গ্রুপ যদি কোনও সত্যকাহিনীর পত্রিকা বার করে, ওই নিলু মানে নিলয় হালদার হবে তার সম্পাদক। ওর একমাত্র যোগ্যতা ও মধুবনের মালিক মোহন মজুমদারের ভাগ্নে। তবে আমরা যদি আমাদের এই রমরমা পরপর কয়েকটা সংখ্যায় ধরে রাখতে পারি, মধুবন আর একটা সত্যকাহিনী বার করার ঝুঁকি নেবে না। ভাল কথা, পরের সংখ্যার কভার-স্টোরির কথা কিছু ভেবেছেন?'

'ভাবাভাবির ব্যাপারটা তো আপনার।'

'আমার মনে হয় এই ধর্ষণ, নিপীড়ন, লাঞ্ছনা নিয়েই পরপর কয়েকটা সংখ্যা চালিয়ে যান। এগুলোর বেশ ভাল একটা বাজার আছে। পরের সংখ্যার সত্যকাহিনী ফাঁদুন একজন স্যাডিস্ট্‌কে নিয়ে। আজ রাত্তিরে একটু ভাবি, কাল ফার্স্ট আওয়ারেই গল্পের মসলার জোগান দেব আপনাকে। তবে হ্যাঁ, সত্যকাহিনীতে বিস্তর অকথ্য-কুকথ্য কান্ড ঘটানোর পরে শেষের দিকে একটা মানবিক লাইন আনবেন। এবারের মতো মিলন টিলন—।'

'কেন বলুন তো?'

'কেন?'

'একটা মানুষের মধ্যে বারো আনা পশু আর চার আনা খাঁটি মানুষের ভাব থাকে। বারো আনা তাই খারাপ চায়, চার আনা ভাল। এই রেশিওতে সত্যকাহিনীর শেষের দিকে মিলন-টিলন-মার্কা ভাল-ভাল কথা আনুন। এটা আপনি একেবারে অঙ্কের হিসেবে বরাবর চালিয়ে যাবেন। দেখবেন সাকসেস রেট পুরো হাড্রেড পারসেন্ট।'

সত্যকাহিনীর জনপ্রিয় লেখক বিনায়ক পাল সম্পাদক সত্যসুন্দরের কথা আর বেদবাক্যের মধ্যে বেশ একটা মিল দেখতে পাচ্ছেন কিছুদিন ধরে। ওঁর প্রতিটি কথাই উনি মন দিয়ে শোনেন, আর সাধ্যমতো যা করার তাই করেন। গল্প-বীজের গোড়ায় জল ঢেলে, সার দিয়ে চমকপ্রদ সব সত্যকাহিনী গড়ে তোলেন। পাঠক কী খায় আর কী খায় না, কী খেতে চায় আর কী পায়— এসব তথ্য ওঁর যেন নখের ডগায়।

আঙুল একটু হেলালেই তরতর করে ডটপেন চলতে থাকে। শব্দমালার ফাঁকে ফাঁকে থাকে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ। ওঁর তৈরি-করা সত্যকাহিনী পড়তে পড়তে ঠাণ্ডা জলের স্রোত পাঠকের মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে বয়ে যায় বহুবার। ঘটনা কোথাও কোথাও এত জঘন্য যে একটু গা-বমি ভারও তৈরি হয়। তবে সত্যকাহিনীর শেষে পৌঁছলে সেটা কেটে যায়। নানা ঝড়-ঝাপটার পরে একটু সুখের মুখ দেখা যায়, অপরাধী, শাস্তিও পায় কোথাও কোথাও।

'সদা সত্যকাহিনী'র পরের তিনটি সংখ্যার মূল বিষয় ছিল সেক্স র‍্যাকেট। সঙ্গে ছিল লাঞ্ছনা আর নিপীড়ন। নায়ক কমবেশি মনোরোগী আর উৎকেন্দ্রিক। কোথাও-কোথাও একটু ঘিনঘিনে ব্যাপার আছে কিন্তু কাহিনী আগাগোড়া রোমাঞ্চকর। একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে উপায় নেই। 'সদা সত্যকাহিনী'র চাহিদা তরতর করে বেড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ধুরন্ধর সম্পাদক চাহিদা অনুসারে জোগান দিচ্ছিলেন না।

অর্থনীতির এই পুরনো হিসেবে কাজ হচ্ছে চমৎকার। পত্রিকার প্রচার সংখ্যা এখন আরও পনেরো হাজার বাড়ানো হয়েছে। চাহিদা আছে অথচ বাজারে পত্রিকা নেই। সত্যিকাহিনীর গল্প এখন ট্রামে-বাসে, অফিসপাড়ায় মুখে মুখে ফিরছে।

সম্পাদক সত্যসুন্দর সত্যকাহিনীর অফিসে আসেন বেলা এগারোটা নাগাদ। লেখক বিনায়ক পাল আসেন সাড়ে-এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। আসার পরে কিছুক্ষণ গল্পটল্প চলে, তারপর দুজনেই ডুব মারেন কাজের মধ্যে। কাল একটি সংখ্যা বেরিয়েছে, আজ কাজ একটু কম। লেখক দফতরে ঢুকতেই সম্পাদক বললেন, 'আমাদের সত্যকাহিনীর ক্রেতাদের একটা বড় অংশ সেক্স ম্যানিয়াক, আর একটা অংশ পাগল। কেউ কেউ প্রায় বদ্ধ-পাগল। এই পাগলদের একজন একটু আগে ফোন করে কী বলল জানেন?'

সম্পাদকের সামনের চেয়ারটায় বসলেন লেখক। 'কী?'

'বলল, আপনাদের সত্যকাহিনীগুলো দুর্দান্ত হচ্ছে। এই সিরিজের লেখাই চালিয়ে যান শুধু। বুঝলাম খ্যাপা। তা, পত্রিকা-সম্পাদকের কাছে খ্যাপা হোক আর ন্যালা হোক, পাঠকমাত্রই লক্ষ্মী। পাঠকদের কে কী চায় সেটা সব সময় জেনে রাখা দরকার। লোকটার

কথা বলার ভঙ্গিটা বিচ্ছিরি, কিন্তু আমি ভদ্র ভাবে জিজ্ঞেস করলাম— আচ্ছা, এই ধরনের লেখাগুলো আপনি চালিয়ে যেতে বলছেন কেন? তা, উত্তরে কী বলল জানেন? বলল, আপনাদের ওই সত্যকাহিনীর মধ্যে যে কায়দাগুলোর কথা লেখা আছে সেগুলো খাসা। আমি আমার জীবনে সব প্রাকটিস করছি। তারপর সে কী হাসির বহর! হাসি শুনে টেলিফোন নামিয়ে রাখি।'

সত্যকাহিনীর লেখক বিনায়ক পাল শুদ্ধ কবি ছিলেন একদা। শিশুর নির্মল হাসি নিয়ে আশ্চর্য সুন্দর একটি কবিতা লিখেছিলেন একসময়। শেষের দিকে এইরকম একটা লাইন ছিল— দানবের অট্টহাস্য ঢেকে দিতে পারো তুমি। শুধু তুমি, শুধু তুমি। পরিচ্ছন্ন চিন্তাভাবনার সেই কবি-মন হঠাৎই বুঝি একটু কাবু করে ফেলেছিল সত্যকাহিনীর দুঁদে লেখককে। লেখক বললেন, 'আমার কিন্তু মাঝেমধ্যে নিজেকে কেমন অপরাধী বলে মনে হয়।'

'কেন কেন?' লেখকের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন সম্পাদক।

বেশ লম্বা একটা নিশ্বাস ফেললেন লেখক। 'সত্যকাহিনীর নামে রগরগে মিথ্যে গপ্পো ফাঁদছি। তার থেকে কারও কারও হয়তো মানসিক বিকৃতিও ঘটছে। আর আপনি এখন যা শোনালেন তা তো ভয়ংকর। কেউ যদি এগুলো নিজের জীবনে ঘটাবার চেষ্টা করে সে তো— ছি-ছি!'

দুদিকে মাথা নাড়তে নাড়তে মুখে একটু জর্দা পান গুঁজলেন সত্যসুন্দর। তারপর দ্রুত একটু চিবিয়ে নিয়ে পানটাকে গালের একদিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'যে পারভার্ট, সে তো এমনিতেই পারভার্ট। এর সঙ্গে বই পড়া না-পড়ার কোনও সম্পর্ক নেই! বিস্তর নিরক্ষর লোক কুৎসিত কাণ্ডকারখানা ঘটায়। তাদের কানের কাছে গিয়ে কেউ এইসব সত্যকাহিনী পড়ে শোনায় না। শোনায় কী?'

একটু তর্ক করার ঝোঁক চেপেছিল লেখকের। গলা সামান্য তুলে বললেন, 'কিন্তু খারাপ বই, খারাপ কথা, খারাপ ঘটনার একটা ছাপ পড়ে তো মানুষের ওপর। বিশেষ করে যাদের বয়েস কম, কিংবা যাদের বয়েস হলেও বুদ্ধিসুদ্ধি পাকেনি—।'

কথাগুলো উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে সম্পাদক বললেন, 'মাস্টারমশাইয়ের মতো কথা বলবেন না তো? ভাল কথা শুনে কেউ ভাল হয় না। খারাপ কথা শুনে কেউ খারাপ হয় না। পৃথিবীতে বিস্তর খানা-খন্দ আছে, প্রত্যেকেরই পা দু-চার বার হড়কায়। ওদিকে জল কোথাও পরিষ্কার, কোথাও ঘোলা। পরিষ্কার জল খান, ঘোলা জলে মাছ ধরুন। বাঁচার এটাই হল সোজা রাস্তা। আচ্ছা, পরের সংখ্যার কভার স্টোরিতে একটু জিনটিন নিয়ে এলে কেমন হয়? একটা লোক একের পর এক জঘন্য সব কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু পরে দেখা গেল সে দোষী নয়, তার জিনই তাকে দিয়ে ওইসব করিয়েছে। জিন নিয়ে এখন তো বিস্তর গবেষণা হচ্ছে শুনি। সেদিন একটা বই পড়ছিলাম, বইটা দেব আপনাকে। রগরগে কাহিনীর ভেতরে-ভেতর কিছু বিজ্ঞানের টার্ম ঢুকিয়ে দিলে ব্যাপারটা বেশ কনভিনসিং হবে। শেষে আপনার সেই মানবিক লাইনটাও—। আচ্ছা, এইরকম একটা ব্যাপার আনলে কেমন হয়?'

'কীরকম?'

'অন্য ধরনের একটা সংকট। প্রশ্নও বলতে পারেন। একটা নির্দোষ মানুষ তার জিনের বিশেষ গঠন বা প্রবণতার শিকার। ন্‌না, বাদ দিন। ভারী হয়ে যাবে। জিন নিয়ে দুচারটে বিজ্ঞানের কথা বলার পরেই আপনি কেচ্ছার দিকে চলে আসুন। একদিকে একটুখানি জ্ঞানের কথা, অন্যদিকে রগরগে ব্যাপার। কোন্‌টা কোথায় কী ভাবে মেশাতে হবে সে তো আপনার মতো আর কেউ জানে না।'

সম্পাদকের পিঠ চাপড়ানিতেও লেখক গল্পের মেজাজে ফিরতে পারলেন না। কোথায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করছিল ওঁর। কভার-স্টোরি লেখা ছাড়াও সত্যকাহিনীর দফতরে রুটিন-মাফিক কিছু কাজকর্ম করতে হয় লেখককে। সেই কাজে মন বসাবার পরে কাঁটার কথাটা উনি ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ধেয় বাড়ি ফেরার পরে একটা টেলিফোন আসতেই কাঁটার জ্বালা ফিরে এসেছিল আবার। তবে মুহূর্তের জন্যে।

টেলিফোনে ধাতব শব্দের মতো একটা গলা বিনায়ক পালকে চাইতেই লেখক বললেন, 'বলছি।'

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশে চড়চড় করে যেন লোহার পাত টানার শব্দ উঠল। বিচ্ছিরি গলাটা বলে উঠল, 'আপনার সত্যকাহিনীগুলো ফাটাফাটি হচ্ছে!'

লেখকমাত্রই বুঝি গুণমুগ্ধ পাঠকের কাছে নরম হয়ে পড়েন। তবে এই ভাল লাগার কথাটা কি ভাল ভাবে বলা যেত না? লেখক এক মুহূর্ত থেমে থাকার পরে বললেন, 'আপনার ভাল লাগছে?'

'লাগছে মানে? লেগে বসে আছে। আপনার সত্যকাহিনীর সব টেকনিকগুলো আমি কাজে লাগাচ্ছি। ফাস্‌ক্লাস। আচ্ছা, ঘোড়ায় খাওয়ার সেক্স সিরাম কোথায় পাওয়া যায় বলুন তো? আমি বহু জায়গায় খোঁজ করেছি, কিন্তু কোথাও পাইনি।'

খটকা লাগল লেখকের, ভক্তদের কথা তো এরকম হয় না! গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?' তারপরেই দড়াম করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

একটু পরে আবার টেলিফোন বাজল। টেলিফোনে আবার সেই ধাতব গলা। 'এই ধরনের কভার স্টোরিই চাই প্রতিবার। ফুর্তির নতুন-নতুন কায়দা চাই। যদি না হয়—।'

গা-হাত পা চিড়বিড় করে উঠেছিল লেখকের। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, 'না হলে কী?'

'মেরে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেব।'

ক্রুদ্ধ ও বিচলিত লেখক রিসিভার নামিয়ে রাখলেন আবার।

।। পাঁচ ।।

পরের পাঁচটা দিন সেই একই গলা একই ভঙ্গিতে বিচ্ছিরি ভাষায় কেমন যেন পালা করে সত্যকাহিনীর সম্পাদক আর লেখককে শাসিয়ে গিয়েছিল। বহু দরকারি ফোন আসে। টেলিফোন না তুললেই নয়, কিন্তু প্রতিবার ফোন তোলার আগে কয়েক মুহূর্ত থমকে

থাকেন এই দুটি মানুষ। আবার ওই লোকটা নয় তো! এ অদ্ভুত এক জ্বালা হয়েছে! পাগলামোর একটা সীমা থাকে তো! ব্যস্ত দুটি কাজের মানুষের মনোযোগ ছিঁড়ে যাচ্ছিল বারবার।

কালি, কলম, মন— এই তিনজন একসঙ্গে থাকলেই নাকি লেখালেখি হয়। কিন্তু তিনজনকে কিছুতেই এক করতে পারছিলেন না সত্যকাহিনীর দুর্ধর্ষ লেখক বিনায়ক পাল। কালি-কলম নিয়ে সমস্যা নেই, কিন্তু মন! ওই ভুতুড়ে ফোন, লোহা টানা গলা আর খারাপ-খারাপ কথা লেখকের মনকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। মনোযোগ নষ্ট হয়েছিল সম্পাদকেরও।

এবারের গল্প-বীজ তাই অন্যান্য বারের মতো জোরদার হয়নি। ওই বীজ থেকে দু-তিন রাতের মধ্যে আশ্চর্য ফল সমেত আশ্চর্য গাছ বানাবার খেলাটাও এবার দেখাতে পারলেন না লেখক। তাছাড়া ওঁর মনের মধ্যে একটু বুঝি প্রতিরোধও দানা বেঁধে উঠেছিল। কাঁহাতক আর প্রতি সংখ্যায় বিদ্ঘুটে পাঠকদের খুশি করার জন্য গাদা-গাদা মিথ্যে ব্যাপার মিলিয়ে-মিশিয়ে সত্যকাহিনী ফাঁদা যায়!

এবারের 'সদা সত্যকাহিনী'র কভারস্টোরি একটু মারই খেল। দুদিনের মধ্যে পত্রিকার সব সংখ্যা হুড়মুড় করে বিক্রি হল না। দুদিনের জায়গায় সাতদিন লাগল। আগের তুলনায় এ তো রীতিমত খুঁড়িয়ে চলা। লক্ষণ ভাল নয়।

বিক্রির টিল-টান নিয়ে দফতরে বসে সম্পাদক আর লেখকের মধ্যে আলোচনা চলল বহুক্ষণ ধরে। দুজনেই একমত— ওই বিচ্ছিরি টেলিফোন কলগুলোই কভার-স্টোরি খারাপ হওয়ার মূলে।

যাকগে, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। তবে এটাও সত্যি, বড় মাপের কোনও কাজ করতে গেলে কিছু উটকো ঝুট-ঝামেলার ধকল নিতে হয়। এই যেমন বিদ্ঘুটে সব ফোন-কল। এবার থেকে এগুলো একেবারেই অগ্রাহ্য করতে হবে। হালকা মেজাজে এই কথাগুলো লেখককে নানাভাবে শোনাবার পরে সম্পাদক বললেন, 'আসলে দোষটা আপনার একার নয়, আপনাদের জাতের'।

'জাতের! মানে?'

'জাত মানে লেখক-জাতের। আপনারা বড্ড বেশি স্পর্শকাতর, অনুভূতিপ্রবণ। আমরা অর্থাৎ সম্পাদকরা ঢের বেশি র‍্যাশনাল—।'

'র‍্যাশনাল অ্যানিম্যাল?'

'আলবাত। বাজে কথা এক কান দিয়ে শুনি আর এক কানে দিয়ে বার করে দিই। ব্যস।'

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পাদক কথাগুলো বলতে না বলতেই ওঁর সামনের টেলিফোন বেজে উঠল। সম্পাদকের ঠোঁটে এক চিলতে বাঁকা হাসি। 'আবার বোধহয় ওই পাগলটা ফোন করছে!' কিন্তু রিসিভার কানে লাগাবার পরে ওঁর মুখ থেকে মজার হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল একদম। মাঝেমধ্যে শুধু 'হুঁ-হ্যাঁ' করে ওদিকের কথাগুলো শুনলেন, তারপর এক সময় রিসিভার নামিয়ে রাখলেন শুকনো মুখে। ওঁর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল।

পকেট থেকে রুমাল বার করে সেই ঘাম মুছলেন।

ওঁর চেহারা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন লেখক। 'কোনও খারাপ খবর কি?'

'খারাপ! হ্যাঁ, খারাপ তো বটেই তবে কেউ আবার খারাপ ধরনের ইয়ার্কিও করতে পারে, কিন্তু—।'

লেখকের উদ্বেগের মাত্রা এক লাফে বেশ কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল। 'এটা কি আপনার কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপার?'

ম্লান মুখে দুদিকে মাথা নাড়ালেন সম্পাদক। 'না-না, সত্যকাহিনীর ব্যাপার। টেলিফোনের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে ধরে নিতে হয় ওই লোকটা পাগল নয়।'

'কার কথা বলছেন?'

'যাকে আমরা পাগল ঠাউরে নিয়েছিলাম। এই যে ক'দিন যে লোকটা আমাকে আপনাকে টেলিফোনে অনবরত আজেবাজে কথা শুনিয়েছে।'

'ওর পরিচয় জানতে পেরেছেন? কে লোকটা?'

কপালের ঘাম মোছার পরে পকেটের রুমাল হাতেই রেখে দিয়েছিলেন সম্পাদক। আর একবার সেটা কপালে বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ভয়ংকর এক মাফিয়া ডন। নানা ধরনের স্মাগ্‌লিং করে কোটি-কোটি টাকা কামিয়েছে। হেরোইনেরও চোরাচালান করে।'

এবার বেশ খোলা গলায় হেসে উঠলেন লেখক। 'মাফিয়া ডনের কাছে আমরা তো নস্যি। কিংবা বলা ভাল, ও যদি হাতি হয়— আমরা সামান্য পিঁপড়ে। আপনি সম্পাদনা করেন, আমি কলম পিষি। এই করে আমাদের অন্ন-সংস্থান হয়। আমাদের পেছনে একজন মাফিয়া রোজ এত সময় দেবে। পাগল?'

'হ্যাঁ, এই মাফিয়া ডন একটু পাগলাটে স্বভাবেরও।'

'কে বলল?'

'এই যে, যে ফোন করেছিল একটু আগে।'

'লোকটা কি আপনার চেনা?'

'না-না, চেনা নয়। বলল, আমাদের হিতৈষী। মাফিয়া ডনের মতলবটা জেনে ফেলেছে বলে আমাদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে।'

দুর্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য লেখক গলা ছেড়ে আর একবার হেসে উঠতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হাঁ করা সত্ত্বেও হাসি এল না। একটু খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপারে হুঁশিয়ারি?'

টেবিলের বাঁদিকে সুন্দর ঢাকনা বসানো এক গ্লাস জল থাকে। সেই জল ঢক-ঢক করে কিছুটা খেয়ে নেওয়ার পরে সম্পাদক বললেন, 'মাফিয়া ডন এক নম্বরের পারভার্ট। সত্যকাহিনী বলে 'আপনি যা যা বানাতেন, লোকটা নিজের জীবনে তাই-তাই প্রাকটিস করত—।'

'আরে আরে, মেটালিক ভয়েসের ওই লোকটা তো টেলিফোন করে এই কথাই আমাকে বলেছিল। আমি বিশ্বাস করিনি।'

রুমাল দিয়ে ঠোঁটের দুটো কোনা মুছে নিয়ে সম্পাদক বললেন, 'মাফিয়া ডন জেনে

গেছে সত্যকাহিনীর মূল আইডিয়া আমি দিই, আর আপনি সেটা খেলিয়ে খেলিয়ে লেখেন। আমাদের দুজনকেই মাফিয়ারাজ তাই এক্সক্লুসিভলি পেতে চায়।'

'কীরকম?'

'মানে একেবারে নিজের মতো করে পাওয়া। প্রতি সপ্তাহে আমরা যে সত্যকাহিনীগুলো বানাব, সেগুলো উনি নেবেন কিন্তু ছাপবেন না।'

'কী করবে তাহলে?'

'সেক্স-ম্যানিয়াক লোকটা নিজের জীবনে সব প্রাকটিস করবে।'

লেখক বিনায়ক পাল এবার একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'মামার বাড়ির আবদার! ওর যা ইচ্ছে তাই করতে হবে আমাদের! আমরা কি ওর কেনা গোলাম?'

অসম্ভব ঠান্ডা গলায় একটু কেটে কেটে উত্তর দিলেন সম্পাদক, 'কিনে নয়, না কিনে লোকটা গোলাম বানাতে চায় আমাদের।'

'মানে?'

'মানে তো সোজা। মাফিয়া ডনরা হামেশাই যা করে থাকে। কিডন্যাপিং। আপনাকে আর আমাকে অপহরণ করে নিজের লুকনো কোনও ডেরায় রেখে দিয়ে সত্যকাহিনী লেখাবে।'

এবারে একটু বুঝি আঁতকে উঠলেন লেখক। তারপর কেমন যেন ধাক্কা-দেওয়া গলায় বলে উঠলেন, 'অত সোজা নয়! দেশে কি আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই?'

বললেন বটে, কিন্তু বলার পরেই ওঁর মনে প্রশ্ন জাগল— দেশে সত্যিই কি আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু আছে?

অন্যান্য দিন এই সময় সম্পাদকের দফতরে বেশ একটা খোলামেলা আবহাওয়া থাকে। বাতাসে জর্দার সুগন্ধ ভাসে। পান চিবুতে চিবুতে সম্পাদক মাঝেমধ্যে দু-চারটে আদিরসাত্মক রসিকতা করেন। কখনও-সখনও শরীরের আড়ামোড়া ভেঙে দু-হাত ওপরে তুলে হাই তুলতে তুলতে উঁচু গলায় 'মা-মা' বলে জগজ্জননী মাকেও ডাকেন। আড়াইটেয় লেবু-চা, সাড়ে-তিনটেয় কালো কফির অর্ডার দেন। আজ হঠাৎ ওই ফোনটা আসায় সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। এখন চা বা কফি কোনওটারই সময় নয়। সম্পাদক সত্যসুন্দর হঠাৎই লেখকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটু কফি চলবে নাকি বিনায়কবাবু?'

জবাবে একদিকে মাথা কাত করলেন লেখক।

একটু পরেই কালো কফি এসে গেল। গরম কফিতে গোটা দুয়েক চুমুক মারার পরে লেখক বললেন, 'ব্যাপারটা সত্যি কি মিথ্যে যাচাই করার জন্যে আপনি কোনও প্রমাণ চাননি ওই লোকটার কাছে?'

'আপনি চাইবেন। ফোন যখন আমার কাছে এসেছে, আপনার কাছেও আসবে। হয়তো আজ বাড়ি ফিরেই পাবেন।'

ঠিক তাই। সন্ধেবেলায় বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ পরেই ফোন পেলেন লেখক। পুরুষের গলা, তবে খুব সরু; সামান্য একটু তোতলামোর ভাবও আছে। সম্পাদক সত্যসুন্দরকে

যে কাহিনী শোনানো হয়েছে ঠিক সেই কাহিনী শোনাল সরু গলা।

সব শোনার পরে লেখক জেরা করার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনি যে সত্যি কথা বলছেন, তার প্রমাণ কী?'

টেলিফোনের সরু গলা জবাব দিল, 'অনেক প্রমাণ আছে, এখন শুধু একটাই দিচ্ছি। কাল বাড়ি থেকে বেরুবার পরে পেছন দিকে নজর রাখবেন। দেখবেন একটা বা দুটো লোক আপনার পিছু নিয়েছে।'

গা কেঁপে উঠল লেখকের। 'কেন?'

'বললাম না মাফিয়া ডন আপনাদের কিডন্যাপ করার মতলব এঁটেছে। একটু ফাঁকা জায়গা পেলেই একটা লোক পেছন থেকে এসে রুমাল দিয়ে আপনার মুখ চেপে ধরবে। অপারেশন শুরু হলেই দেখবেন ওই লোকটা একা নয়, আশপাশ থেকে আরও দু-তিনজন ছুটে এসেছে। সঙ্গে গাড়ি আছে ওদের। আপনি টু শব্দটাও করতে পারবেন না। চোখের পলকে ওরা আপনাকে গাড়িতে তুলে নিয়েই সরে পড়বে। আচ্ছা-আচ্ছা জাঁদরেল লোককে ওরা অপহরণ করে, আপনি বা সম্পাদক ওদের কাছে হিসেবের মধ্যে পড়েন না। আপনি রোগা পটকা লোক, যদি খুব ভাল ছুটতে পারেন— ধরে ফেলার আগে ছুটতে পারলে বেঁচে যাবেন। তবে ওই একবারই। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ওরা আপনাকে ঠিক ধরবে। তারপর ওদের ডেরায় নিয়ে গিয়ে তোলার পরে খোলা দরজা পেলেও আর পালাবার প্রশ্ন উঠবে না আপনাদের।'

ঠাণ্ডা জলের মতো কী যেন ছুটে গেল লেখকের মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে। শুকনো গলায় ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

'কেন আবার, ছোটা তো দূরের কথা, দাঁড়াবারই উপায় থাকবে না। হাঁটুর নীচে থেকে আপনাদের পা কেটে বাদ দিয়ে দেবে মাফিয়া ডন। পাকা খবর পেয়েছি। বসে বসে তখন আপনাদের কাজ হবে শুধু ওই নোংরা লোকটার জন্যে সত্যকাহিনী লেখা।'

আর একবার ঢোক গিলে টেলিফোনের রিসিভার আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলেন লেখক।

রাত্তিরে ভাল ঘুম হল না লেখকের। যেটুকু যা ঘুমিয়েছেন তার মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখা হয়ে গেছে দু-তিনটে। পরদিন পত্রিকা অফিসের পথে পা বাড়িয়েই সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুটা হাঁটেন আর পেছনের দিকে একবার করে চোখ ঘুরিয়ে নেন। বাড়ি থেকে বাস-স্টপে পৌঁছতে মিনিট-দশেক লাগে। প্রথম দিকে কিছুই তেমন নজরে পড়েনি। কিন্তু শেষের দিকে বুঝতে পারলেন, চোয়াড়ে গোছের একটা লোক পিছু নিয়েছে ওঁর।

ব্যাপারটা ঠিক কি না জানার জন্যে মাঝপথে বাস থেকে নেমে পড়লেন লেখক। হ্যাঁ, ওই লোকটাও নেমেছে। লোকটাকে এক নজর দেখেই ছুটে গিয়ে আর একটা বাসে উঠে পড়লেন। উনি প্রথম গেটে, বিচ্ছিরি চেহারার লোকটা দ্বিতীয় গেটে। না, আর কোনও সন্দেহ নেই; লোকটা সত্যিই ওর পিছু নিয়েছে।

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল লেখকের। সত্যকাহিনীর অফিসের সামনেই বাস স্টপ। স্টপে নেমে পেছন দিকে তাকাবার সাহস হল না আর। লম্বা পায়ে হেঁটে অফিসে ঢুকে পড়লেন।

দফতরে ঢোকার পরে আর একটা ধাক্কা। হাসিখুশি চেহারার সম্পাদক সত্যসুন্দরের চেহারা এক রাত্তিরের মধ্যে ঠিক অর্ধেক হয়ে গেছে।

কথা একটু চলাচলির পরে জানা গেল, দুজনেরই অভিজ্ঞতা এক। সরু গলা সম্পাদকের বাড়িতেও ফোন করেছিল। অফিসে আসার পথে ওঁরও পিছু নিয়েছিল গুণ্ডাগোছের একটা লোক।

বেয়াড়া ঘটনার চাপে পরের সংখ্যার কভার-স্টোরি লেখার কাজ শিকেয় উঠেছিল। সম্পাদক এবং লেখক চায়ের সময় কফি, কফির সময় চা, টিফিনের সময় বেলের সরবত খাওয়ার পরে ঠিক করলেন— যথেষ্ট হয়েছে আর সত্যকাহিনী নয়। সামনের সংখ্যায় কভার-স্টোরি হোক শাকপাতা।

অত দুঃখের মধ্যেও হেসে উঠেছিলেন লেখক। 'শাকপাতা! শাকপাতা দিয়ে কী কভার-স্টোরি হবে!'

সম্পাদক সত্যসুন্দর স্নায়ুর চাপে ভুগছিলেন। একটু বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কেন? শাকপাতা দিয়ে কি কভার-স্টোরি হয় না?'

একজন লেখক অনেকের মনের কথা জানেন। মন নিয়েই তো কারবার করতে হয়। অচেনা লোকের মনের কথা যিনি টের পান, কাছের লোকের মনের কথা তিনি তো টের পাবেনই। সত্যসুন্দর কী নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, লেখক জানেন। নিছক জানাই নয়, তিনি নিজেও এখন কমবেশি ওই রোগের শিকার। রোগ কখনও বাড়ছে কখনও কমছে এই যা। ঢোক গিলে বললেন, 'শাকপাতা কেন কভার-স্টোরি হবে না, নিশ্চয়ই হবে। তবে আমাদের পত্রিকা তো শুধু রোমাঞ্চকর সত্যকাহিনীর পত্রিকা। লোকে গালাগালি দেয় ঠিকই, কিন্তু গ্যাঁটের পয়সা খরচা করে পত্রিকা কিনে পড়ার পরে গালাগালি দেয়। আমাদের সেলিং পয়েন্ট হল রগরগে মসলা। শাকপাতার মধ্যে আপনি তা কী করে আনবেন?'

'আনার দায়িত্ব আপনার। আপনি লেখক।'

'হ্যাঁ, আমিই আনি। কিন্তু আমাকে মসলা-পত্তর তো সব আপনিই জোগান দেন। আমি নিছক কারিগর। লোকে তা জানুক বা না জানুক, আমি তো জানি। আপনি ছাড়া আমি একেবারে অচল।'

অন্য সময় হলে এই ধরনের কথা শুনে দুঁদে সম্পাদক মৃদু মৃদু হাসতেন কিংবা খুব মৃদু ভঙ্গিতে প্রতিবাদ করতেন। কিন্তু এখন আর ওঁর মধ্যে ওই ধরনের কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। থমথমে মুখে বললেন, 'শাকপাতাই হবে আমাদের পরের সংখ্যার কভার স্টোরি। এক্ষুনি লিখতে শুরু করে দিন আপনি।'

লেখক বিনায়ক পাল রগরগে কভারস্টোরিকে দাঁড় করিয়ে দিতে বেশি সময় নেন না কখনও। কাগজে কলম ছোঁয়ান, আর সেই কলম তরতর করে ছুটতে থাকে। লেখার মধ্যে বেশ একটা নাটকীয়তা আছে। তার ফলে পাঠকরা ওই কাহিনী একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে থামতে পারে না। কিন্তু শাকপাতা নিয়ে উনি কী গপ্পো ফাঁদবেন।

লেখককে মুখ চুন করে বসে থাকতে দেখে সম্পাদক বললেন, 'ভাবুন-ভাবুন, ভাবলে

ঠিক একটা লাইন পেয়ে যাবেন। আপনার কলম তো কথা বলে।'

কিন্তু এই মুহূর্তে না লেখক না তাঁর কলম— কেউই কোনও কথা বলছিল না।

সম্পাদক সত্যসুন্দর পানের ডিবে আনেন না, ওঁর পান থাকে একটা ঠোঙার মধ্যে। বিষণ্ণ মুখে ঠোঙা থেকে একটা পান বার করে মুখে ফেললেন, তারপর এক টিপ জর্দা। একটু বাদেই ছোট্ট একটা হেঁচকি উঠল। সম্পাদক গম্ভীর গলায় বললেন, 'অ্যাদ্দিন চরিত্র খারাপ করার পথ বাতলেছি, এবার চরিত্র গঠন করার পথ দেখাব। সে দেখানো আবার হেজিপেজি উপায়ে নয়, আমাদের শাশ্বত ভারতের লাইনে। কিছু বুঝতে পারলেন?'

শুকনো মুখে দু'দিকে মাথা নাড়লেন লেখক।

সম্পাদক জানলা দিয়ে বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে বললেন, 'চিরন্তন ভারতবর্ষের পথ কিন্তু শাকপাতার পথ। এই যেমন— মেথি পাতা, তুলসী পাতা, পুদিনা পাতা, থানকুনি পাতা— এগুলো নিছক পাতা নয়— এর মধ্যেই রোগ তাড়াবার সব শক্তি আছে। খেলে শুধু শরীরই নয়, মনও সচল নয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। আপনি মানেন তো?'

ব্যাজার মুখে লেখক উত্তর দিলেন, 'আমার মানাটা বড় কথা নয়, তবে অনেক লোকেই মানে।'

'ঠিক। কিন্তু কেন মানে? শাকপাতায় শক্তি আছে বলেই তো মানে। এই সব শাকপাতার রস নিয়মিত সেবন করলে শরীরের ধারে কাছে কোনও রোগ আসতে পারে না। ঠিক না?'

বিখ্যাত লেখক বিনায়ক পালের ব্যাজার ভাব আরও বেড়ে গিয়েছিল। শুকনো গলায় বললেন, 'কিন্তু এ সব তো স্বাস্থ্য-পত্রিকার বিষয়। আমরা কি পত্রিকার চরিত্র পালটে দিচ্ছি?'

'না-না, পত্রিকার চরিত্র যেমন আছে তেমনি থাকবে;আমরা জনসাধারণের চরিত্র পালটে দেব। পাঠকরা আমাদের পত্রিকা পড়ে শান্ত, সংযত হবে। অনাচার বন্ধ করবে। আমাদের পত্রিকা একবার পড়লে বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ধার-কাছ মাড়াবে না কেউ। আমাদের 'সদা সত্যকাহিনী' এবার থেকে সত্যিকারের সত্যকাহিনী হবে। শাকপাতার কয়েকটা মাত্র গুণের কথা বললাম, আরও অনেক গুণ আছে।'

'কী-কী?'

সম্পাদক সত্যসুন্দর একটু বিব্রত মুখে বললেন, 'আপনি দেখছি মাস্টারমশাইয়ের মতো প্রশ্ন করছেন। সব কি এক্ষুনি-এক্ষুনি বলা যায়? একটু ভাবার সময় দিন আমাকে। আপনি এক কাজ করুন না— আমাদের লাইব্রেরিতে আয়ুর্বেদের ওপর দু-তিনটে বই আছে, আপনি ওই বইগুলো একটু ঘেঁটে নিন না—।'

খসখসে গলায় বিনায়ক বললেন, 'আপনার পরামর্শেই এতদিন বিস্তর নোংরা ঘেঁটে বানিয়ে বানিয়ে সত্যকাহিনী লিখেছি। আপনি বললে এখন আমি আয়ুর্বেদের বইপত্তরও ঘাঁটব। কিন্তু আপনি দয়া করে বলে দিন— শাকপাতার সত্যকাহিনী কোন্ লাইন ধরে এগোবে?'

ডাকসাইটে সম্পাদক সত্যসুন্দরকে এবার একটু অসহায় দেখাল। খুব নরম গলায় বললেন, 'আপনি আমার অত্যন্ত প্রিয় কভার-স্টোরি লেখক। আপনি কলম ধরেছিলেন

বলেই আমাদের সত্যকাহিনীর প্রচার সংখ্যা হু-হু করে এত বেড়ে গেছে। পত্রিকাটা ফলন্ত গাছ। সেই গাছের গোড়া আপনাকে কাটতে বলছি না। কিন্তু আপনি তো বুঝতে পারছেন— কেন আমি এই পত্রিকার প্রচ্ছদ-কাহিনী পালটাবার কথা ভাবছি। টেলিফোনে ওই বিচ্ছিরি গলার ধাতানি আর সহ্য করতে পারছি না। আমরা যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয়— তাহলে তো আমরা এখন ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে। আমার মতলবটা আপনাকে খুলেই বলি।'

শাকপাতার চাপে টেলিফোনের জঘন্য ওই কথাগুলো অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে লেখক বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন। সম্পাদক মনে করিয়ে দিতেই সব মনে পড়ে গিয়েছিল ওঁর। ফ্যাকাশে মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মতলব?'

একটু ইতস্তত করার পরে মুখ খুলল সম্পাদকের। 'ওই বদমাইসগুলোর চোখ আমি একটু অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছি। কয়েক সংখ্যা সত্যকাহিনী একটু নিরামিষ ধরনের কভার-স্টোরি বার করবে। ভেতরের অন্য কোনও লেখার মধ্যেও রগরগে ব্যাপারটা থাকবে না। এটা আমাদের রণকৌশলের নীতি বলতে পারেন। ওই পাজি লোকগুলো আমাদের পত্রিকায় রগরগে ব্যাপার না পেলেই অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নেবে। তখন আমরা আবার আগের ওই ফর্মে ফিরে যাব। আমি কি ব্যাপারটা আপনাকে বোঝাতে পারলাম?'

লেখকের চোখমুখ ঝলমলে হয়ে উঠেছিল। 'আপনি ঠিকই বলেছেন। চরিত্র আর স্বাস্থ্য গঠন মার্কা লেখা পর পর কয়েকটা সংখ্যায় বেরুলেই বদ লোকগুলো চোখ ফিরিয়ে নেবে অন্যদিকে।'

লেখকের সমর্থন পেয়ে সম্পাদকের মুখেও একটু হাসি ফুটেছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'তবে শাকপাতা প্রচ্ছদ-কাহিনী হলেও আপনি কিন্তু বিষয়টাকে অবজ্ঞা করবেন না। আমাদের লাইন এবার কী হবে জানেন— দিশি পানীয় খান, বিলিতি পানীয় বর্জন করুন— অনেকটা এই লাইনে। স্বদেশী আমলের সেই জোয়ারটার কথা ভাবুন। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই— এই গোছের আর কী। সনাতন ভারতবর্ষে যা-যা চর্চা হত— সেই দিকে পাঠকের চোখ টেনে আনতে হবে। প্রাচীন ভারতে সব ছিল। সুস্থ হয়ে বাঁচতে গেলে, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে শাকপাতায় আসুন। আমি যা বলতে চাইছি বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই?'

দুর্ধর্ষ লেখক বিনায়ক পালের চোখে-মুখে স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ সব বুঝতে পেরেছি। আপনার সঙ্গে আমার কদ্দিনের সম্পর্ক। আপনি হাঁ করলেই আমি বুঝতে পারি আপনি কী চাইছেন।'

।। ছয় ।।

পরের সংখ্যা 'সদা সত্যকাহিনীর' প্রচ্ছদকাহিনী হল— 'শাকপাতা, পাতা-শাক— সকলেই বেঁচে থাক।' পাতায় পাতায় থানকুনি, তুলসি, পুদিনা, মেথি ইত্যাদি শাকের রঙিন ছবি। কয়েকজন সুন্দরী চিত্রাভিনেত্রীর ছবিও ছাপা হয়েছে শাকপাতার পাশে। প্রত্যেকের

মুখ দিয়েই বলানো হয়েছে— এই সব শাকপাতাই তাদের জীবন-যৌবনকে মোক্ষমভাবে ধরে রেখেছে। কভারের রঙিন ছবি এক মডেলের। মডেল গাঁয়ের গৃহবধূ সেজে তুলসীতলায় প্রদীপ দিচ্ছে।

শাকপাতার প্রচ্ছদ-কাহিনীকে নাটকীয় এবং আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যাপারে লেখকের চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না। অফিসের লাইব্রেরিতে আয়ুর্বেদ নিয়ে একটা মাত্র বই পাওয়া গিয়েছিল। পুরনো দিনের এক পণ্ডিতের লেখা। বইতে সংস্কৃত শ্লোকের ছড়াছড়ি আর বাংলা কী কঠিন! তার ওপর গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো পোকায় কেটে দিয়েছে। কিন্তু কোনও বাধাই লেখককে দমাতে পারেনি। সঙ্গে ছিল সম্পাদকের উপদেশ। সম্পাদক বলেছেন: সব দুরারোগ্য অসুখের নাম করে লিখে দিন— সব অসুখই সারাতে পারে এইসব শাকপাতা। তবে নিয়ম মেনে কিছুকাল সেবন করতে হবে। সম্পাদকের উৎসাহ পেয়ে লেখকের কল্পনাশক্তি লাগাম-ছাড়া হয়ে উঠেছিল। উনি বিস্তর প্যাঁচ-পয়জার কষে যা লিখলেন— তার সারাংশ হল: শাকপাতার রস শুধু একটা জিনিসই পারে না— তা হল মরা মানুষ বাঁচানো।

পরের সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী 'পুরনো তেঁতুলের উপকারিতা', তার পরেরটার 'অব্যর্থ কাঁচা হলুদ ও নিমপাতা।'

যত্নের কোনও ত্রুটি ছিল না কোথাও, কিন্তু রগরগে সত্যকাহিনীর পাতায় এই সব দেখে পাঠকরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সত্যকাহিনীর সংখ্যা পত্রিকার স্টলে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রি হয়ে যেত, কিন্তু নিরামিষ প্রচ্ছদ-কাহিনী ছাপার জন্যে বিক্রিবাটা মুখ থুবড়ে পড়েছিল। পত্রিকা বিক্রি না হলে ফেরত নেওয়ার নিয়ম। আগে এক কপিও ফেরত আসত না পত্রিকার অফিসে। কিন্তু শেষ তিনটি সংখ্যার প্রায় সব কপিই ফেরত এসেছিল। ধরতে গেলে কিছুই বিক্রি হয়নি।

'সদা সত্যকাহিনী' পত্রিকার মালিক নির্মল গুঁইয়ের লোহার গ্রিল তৈরির ব্যবসা। এতদিন বেশ মজায় ছিলেন মালিক। সত্যকাহিনী বিক্রির সুবাদে বেশ ভালই লাভ হত। হঠাৎ ব্যাপারটা ঘুরে যেতেই ঘাবড়ে গেলেন মালিক। একটা সংখ্যা নয়, দুটো সংখ্যা নয়, পর-পর তিনটে সংখ্যার একই হাল দেখে তিনি একদিন সটান চলে এলেন পত্রিকার অফিসে। অফিসে তখন সম্পাদক এবং লেখক দুজনেই ছিলেন।

ওঁদের দিকে তাকিয়ে মালিক উত্তেজিত গলায় বললেন, 'এসব কী আরম্ভ করেছেন আপনারা? প্রথমটা গেল শাকপাতা, পরেরটা পুরনো তেঁতুলের উপকারিতা, তার পরেরটা কাঁচা হলুদ ও নিমপাতা। তিনটে সংখ্যার কিছুই বিক্রি হয়নি। ফেরত আসা কপিতে আমার গোডাউন ভর্তি হয়ে গেছে, গ্রিল রাখার জায়গা পাচ্ছি না। এই ভাবে চলতে থাকলে আমাদের বসতবাড়িকে পুরনো পত্রিকার গোডাউন বানিয়ে বউ-বাচ্চা সমেত পথে নামতে হবে। আপনারা আপনাদের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে এবার দয়া করে আসুন। আমি আর সত্যকাহিনী বার করব না।'

সোজা কথা, কোনও রাখ ঢাক নেই। সম্পাদক আর লেখক দুজনেই জানেন মালিকের কথা-কাজে নড়চড় হয় না। সুতরাং দুজনের কেউই আর মালিককে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করার পথে গেলেন না। হিসেবের টাকা বুঝে নিয়ে পথে এসে দাঁড়ালেন। মালিক মোটা

টাকা দিতেন দুজনকে। এমন ভাল চাকরি খোয়ালে তো দুঃখ হওয়ার কথা। কিন্তু অবাক কাণ্ড, চাকরি খুইয়ে লেখক আর সম্পাদক বেশ স্বস্তি বোধ করছিলেন।

ফুরফুরে হাওয়ায় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দুজনেরই মনে হচ্ছিল— এই চাকরিটা নেই মানে সেই অযথা উদ্বেগ-উত্তেজনাও নেই। কিন্তু বাড়ি ফেরার পরে দুজনেই সেই ধাতব কণ্ঠ আর সরু গলার টেলিফোন পেয়েছিল। টেলিফোন পেয়ে ওরা সোল্লাসে বলেছিল: আমরা ও চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। বিশ্বাস না হলে আমাদের মালিককে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

কথাটায় দারুণ কাজ হয়েছিল। দুটি কণ্ঠই মিইয়ে গিয়েছিল একদম। সম্পাদক আর লেখক ইদানীং পথ চলার সময় ভাল করে লক্ষ করে দেখেছেন— না, ওদের আর কেউ পিছু নেয় না।

টেলিফোনের বিদ্‌ঘুটে উৎপাত আস্তে আস্তে কমে গেল একদম। এর মতো শান্তি আর কী আছে!

বাঁচার আনন্দে প্রবীণ লেখক আর সম্পাদক সেদিন চৌরঙ্গির ফুটপাথে-ফুটপাথে ঘুরে বেড়ালেন অনেকক্ষণ। হাজার রকম চোখ ভোলানো জিনিসপত্র বিক্রি হয় ফুটপাথে। কেনাকাটা করবেন না তবু দর-দাম করলেন। টেলিফোনের সেই অস্বস্তিকব ধমক আর হুমকি এখন অতীতের ব্যাপার। ওই সব বিদ্‌ঘুটে ঝুটঝামেলা না থাকলে বাঁচাটা সত্যিই কত আনন্দের হয়ে ওঠে।

ফুটপাথে কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরির পরে প্রবীণ দুই সম্পাদক আর লেখক একটা দোকানে ঢুকে টিকিয়া, ভেলপুরি আর কুলপিমালাই খেলেন। তারপর চৌরঙ্গির চার-রাস্তার মোড়ের পানের দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভাল খাওয়াদাওয়া করার পরে দুজনের মনেই বেশ ফুর্তির ভাব জেগেছিল।

পানের দোকানের দোকানদার চেনা। সম্পাদক গলা তুলে বললেন, 'ডবল পান লাগাও।'

লেখক পান খান না, কিন্তু সম্পাদকের কথায় আজ খেলেন। সম্পাদক সিগারেট খান না, কিন্তু লেখকের কথায় আজ একটা ধরালেন। ওদিকে পানের জাবর কাটা, এদিকে কিং-সাইজ দামি সিগারেটের ফিনফিনে ধোঁয়া ওড়ানো। দুজনের প্রায় একসঙ্গেই মনে হয়েছিল— নাহ্। পৃথিবীটা সত্যিই বেশ ভাল জায়গা। দুজনের মুখেই বিস্তার অবান্তর কথা, দুজনের মুখেই একটানা অহেতুক হাসি।

এমন একটা পরিস্থিতির জন্যেই বোধহয় অপেক্ষা করছিলেন মধুবন গ্রুপ অব পাবিলকেশন্‌স-এর সার্কুলেশন ম্যানেজার অলকেশ মহাপাত্র। এই মানুষটিকে সম্পাদক আর লেখক দুজনেই চেনেন।

অলকেশ এগিয়ে এসে ওঁদের কুশল সংবাদ নেওয়ার পরে খুব বিনীত ভাবে বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে মোহনবাবু একটু কথা বলতে চান—। বেশিক্ষণ সময় নেবেন না। তবে খুব জরুরি কথা। এখন যদি দয়া করে আমার সঙ্গে একবার আসেন— বাড়ি ফেরার জন্য ভাববেন না, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আমি আপনাদের, দুজনকেই বাড়িতে পৌঁছে দেব। প্লিজ, একবারটি আসুন।'

হাতে এখন কোনও কাজ নেই। অযথা উদ্বেগ-উত্তেজনাও উধাও হয়ে গেছে। পেট ভরে মুখরোচক খাবার আর পান খেয়ে দুজনেই বেশ একটু উদার প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিলেন। সম্পাদক বললেন, 'হাতে উপস্থিত তেমন কোনও কাজ নেই। যাওয়া যেতে পারে। চলুন।'

অলকেশ খুব যত্ন-আত্তি করে সম্পাদক আর লেখককে ওঁর গাড়িতে তুলে নিলেন। কাছেই মধুবনের অফিস, চট করে সেখানে পৌঁছে গেলেন ওঁরা।

মধুবনের মালিক মোহন মজুমদার পয়সাওয়ালা মানুষ। একটা সময় চিৎপুরে ওঁর মস্ত একটা যাত্রার দল ছিল। ভীষণ রমরমা ছিল সেই দলের। কিন্তু যাত্রার বাজারটাই খারাপ হয়ে গেলে ব্যবসা পালটেছেন মোহনবাবু। এখন ব্যবসা বলতে বেশ কয়েকটা পত্র-পত্রিকা বার করা। সব পত্রিকা সমান চলে না, তবে কয়েকটা পত্রিকা মালিককে ভাল লাভের মুখ দেখিয়েছে। ব্যবসাটা উনি এখন বাড়াতে চাইছেন।

সম্পাদক এবং লেখককে মহা সমাদরের সঙ্গে নিজের ঘরে বসিয়ে গল্প জুড়ে দিলেন মোহনবাবু। গল্প মানে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে ওঁর নানা পরিকল্পনার কথা শোনানো। গড়গড় করে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়ে দিলেন দুজনকে।

মধুবন দৈনিক পত্রিকা। মন্দ চলছে না। তাই পত্রিকাটিকে ঘিরে আরও কয়েকটা পত্রপত্রিকা বেরিয়েছে। মোহনবাবুর খুব ইচ্ছে— একটি সত্যকাহিনীর পত্রিকা বার করেন। রেজিস্ট্রেশন নেওয়া হয়ে গিয়েছে নাম 'সদা সর্বদা সত্যকাহিনী।' সম্পাদক হবেন মোহনবাবুর ভাগ্নে নিলয় হালদার। একটু বাদে নিলয়ও এসে ঢুকলেন ওই ঘরে।

টেবিলে কফি আর কাজুবাদাম আসার পরে মোহনবাবু প্রায় হাতজোড় করে বললেন, "আমার খুব ইচ্ছে 'সদা সত্যকাহিনী'র ধাঁচে একটা পত্রিকা বার করি। করলে কেমন হয় বলুন তো?"

সত্যসুন্দর একটু উদাসীন ভঙ্গিতে বললেন, "এ ব্যাপারে আমি আর আপনাকে কী পরামর্শ দেব। আপনি এত বড় একটা গ্রুপের প্রধান সম্পাদক। আপনি যদি চান বার করতেই পারেন।

মোহনবাবু আরও বিনীত হয়ে পড়লেন। 'না-না, আপনি ওভাবে পাশ কাটাবার ভঙ্গিতে বলবেন না। আপনি এত ভাল একটা পত্রিকা বার করেন। আমরা তো বাজারের খবর রাখি। 'সদা সত্যকাহিনী'র প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল মাত্র পাঁচ হাজার। কিন্তু মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই আপনি ওই পত্রিকার সারকুলেশন এক লক্ষ সতেরো হাজারে তুলে দিয়েছিলেন।'

একটু অবাক হয়ে সত্যসুন্দর বললেন, 'সার্কুলেশন ফিগার তো পত্রিকার ভেতরের খবর। আপনি এটা জানলেন কী করে?'

ধূর্ত একটা হাসি ফুটে উঠেছিল মোহন মজুমদারের মুখে। 'আমি তো এখন পত্রপত্রিকার লাইনের ব্যবসাদার। আমার পক্ষে এটা জানা এমনকী কঠিন কাজ। আপনাদের পত্রিকার সোল এজেন্টকে ট্যাপ করেই এটা জেনে গিয়েছি।'

'তাহলে পত্রিকার সার্কুলেশন এখন কোথায় দাঁড়িয়েছে, তাও নিশ্চয় জানেন?'

'আপনাদের পত্রিকা প্রচার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এক লক্ষ সাতাত্তরে গিয়ে পৌঁছে

ছিল। এখন তো হাওয়াই বাজি উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যাওয়ার দশা। গত তিন সংখ্যায় ওই পত্রিকা একেবারে আছড়ে মাটিতে পড়েছে। লেটেস্ট ইসু পাঁচ-সাত হাজারের বেশি বিক্রি হয়নি। বিক্রি না-হওয়া কপিগুলো সব ওই নির্মল গুঁইয়ের গ্রিলের গোডাউনে বোঝাই হয়েছে।'

সত্যসুন্দরের মুখ এবার একটু ম্লান হয়ে উঠল। 'এত সব জানার পরেও আপনি পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চাইছেন?'

'কেন চাইব না? শেষের তিনটে সংখ্যা তো আর সেই আগের সত্যকাহিনী ছিল না। লোকে তো রগরগে জিনিসপত্র চায়। আপনি আইডিয়া দিতেন আর বিনায়কবাবু লিখতেন। সম্পাদকের আইডিয়া দুর্ধর্ষ আর লেখকের কলম সোনার কলম—যাকে বলে মণিকাঞ্চন যোগ।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মোহনবাবুর দিকে তাকালেন সত্যসুন্দর। 'আপনি এত খবর রাখেন?

আবার অতি মাত্রায় বিনীত হলেন মধুবন গ্রুপ অব পাবলিকেশন্‌সের মালিক। 'খবর তো একটু আধটু রাখতেই হবে। আমরা তো এই পত্রপত্রিকার ব্যবসা করেই খাই। আপনারা দুজনেই খুব গুণী মানুষ। আপনাদের কাছে পরামর্শ চাইব না তো কাদের কাছে চাইব?'

সত্যসুন্দর আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিলেন মোহন মজুমদারকে, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

মোহনবাবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, "আমার পত্রিকার মডেল কিন্তু আপনার তিন সংখ্যা আগের 'সদা সত্যকাহিনী'। আমি এই পথে অনেকটা এগিয়েও গিয়েছি। আমার পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন নেওয়া হয়ে গিয়েছে। পত্রিকার নামটাও দিয়েছি আপনার পত্রিকার ধাঁচে। নাম হচ্ছে 'সদা সর্বদা সত্যকাহিনী'। মলাটের মাথায় খুব ছোট টাইপে লেখা থাকবে 'সদা সর্বদা', আর ঠিক তার নীচেই বিরাট হরফে 'সত্যকাহিনী'। এই কায়দাটাও আপনার কাছ থেকে ধার করা।"

সত্যসুন্দর হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'তাহলে আর আটকাচ্ছে কোথায়? বার করে ফেলুন আপনার পত্রিকা।'

আবার সেই ধূর্ত হাসিটা ফুটে উঠেছিল মোহনবাবুর মুখে। 'জাহাজ তৈরি হলেই কি জলে ভাসানো যায়? উপযুক্ত ক্যাপ্টেন দরকার। আমার সব আছে, যা নেই তা হল যোগ্য সম্পাদক আর ধুরন্ধর প্রচ্ছদকাহিনী-লেখক।'

সত্যসুন্দর রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে বললেন, 'কথায় বলে, ঘোড়া থাকলে চাবুকের অভাব হয় না। আপনার ঘোড়া যখন আছে, চাবুকের জন্যে দুশ্চিন্তা করার কোনও মানে হয় না।'

মোহনবাবু এবার পরিষ্কার হাতজোড় করে বললেন, 'আমার খুব ইচ্ছে আপনারা দুজনেই আমার এই সত্যকাহিনী পত্রিকায় যোগ দিন। আপনি সম্পাদক, আর বিনায়কবাবু প্রচ্ছদকাহিনী-লেখক।'

অবাক হয়ে সত্যসুন্দর বললেন, 'কিন্তু আমি শুনেছিলাম যে, নিলয়বাবু আপনার এই পত্রিকার সম্পাদক হবেন?'

'আপনি ঠিকই শুনেছিলেন। নিলু নিজেই সম্পাদক হতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি রাজি হইনি। হব কেন? পত্রিকা সম্পাদনার ও কী বোঝে। বিশেষ করে এই ধরনের পত্রিকা—। প্রতি সংখ্যায় বানানো সত্যকাহিনী লেখা কী চাড্ডিখানি কথা? পত্রিকা বার করা মানে ব্যবসা করা। ব্যবসা নিয়ে ছেলেখেলা করা যায় না। নিলুকে আমি সব বুঝিয়েছি, ও বুঝেছে। ও শুধু পত্রিকা প্রকাশনের ব্যাপারটা দেখবে। ওই ব্যাপারেও আপনার পরামর্শ ছাড়া ও এক-পা এগুবে না। পত্রিকার বিষয়ে আপনার কাজে কেউ নাক গলাতে আসবে না। আপনারা আগের পত্রিকায় যা পেতেন তার থেকে আমি দু-হাজার করে বেশি দেব।'

সম্পাদক গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন, 'ঠিক আছে, আমাদের একটু ভাবতে দিন। এক সপ্তাহ বাদে জানাব।'

'না-না, ভাবাভাবির মধ্যে আর যাবেন না। আপনাদের দুজনকেই আমি পাঁচ হাজার করে বেশি দেব। আজকেই আপনাদের হাতে হাতে অফার লেটার দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের লেটার অব অ্যাকসেপ্টেন্সটা দিয়ে দিন। আজ থেকে ঠিক দু-মাস বাদে রথযাত্রা। শুভদিন। ওই দিন থেকেই আমাদের সত্যকাহিনীর পত্রিকাটা বার করতে চাই। প্লিজ, আপনারা আর দোনামনা করবেন না।'

সত্যসুন্দর মুচকি হেসে বিনায়কের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী বলব বলুন?'

লেখক লোক-চরিত্র ভাঙিয়ে খান। পরিষ্কার 'হ্যাঁ' বা 'না'-এর মধ্যে না গিয়ে বললেন, 'আপনি যা ভাল বুঝবেন তাতেই আমার মত।'

সত্যসুন্দর বেশ চওড়া করে হেসে বললেন, 'দিন, আমাদের কী চিঠিপত্তর দেবেন দিন। সই-টই করে দিচ্ছি।'

মোহনবাবুর ভাগনে নিলু সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন অফিস-সেক্রেটারির কাছে। দু-মিনিটে তৈরি হয়ে গেল অফার লেটার। ওই চিঠিটা পাওয়ার পরে লেটার অব অ্যাকসেপ্টেন্সে সই দিয়ে দিলেন সত্যসুন্দর ও বিনায়ক।

মোহনবাবুর চোখ-মুখ ঝলমল করছিল খুশিতে। 'যাক, শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল বিখ্যাত জুটিকে। অনেকদিন ধরেই আপনাদের দুজনকে চাইছিলাম। তবে একটা কথা—।'

'কী'

"আপনাদের ওই 'সদ্য সত্যকাহিনী'র শেষের তিনটি সংখ্যায় শাকপাতা-মার্কা যে কভার-স্টোরি বেরিয়েছে তেমন কিছু কিন্তু চাই না। আগে যেমন হত তেমন সত্যকাহিনী চাই— রগরগে, মসলাদার।"

মুচকি হেসে সত্যসুন্দর বললেন, 'আগের মতো রগরগে সত্যকাহিনী বানাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। আগের মতো সত্যকাহিনী বার হলে টেলিফোনে আর কেউ আমাদের ভয় দেখাবে না। আপনার কী মনে হয়?'

অবিকল চিৎপুরের যাত্রার ঢঙে পাক্কা এক মিনিট ধরে হাসার পরে মোহন মজুমদার বললেন, 'কী করে ধরলেন আমাকে?'

সত্যসুন্দরও হাসলেন। তারপর হাসতে হাসতেই বললেন, 'ওই যে কী বলে না— ধাতব-কঠিন গলা, আপনার ওই গলা টেলিফোনে শুনলেও তো ভোলা কঠিন।'

বিনায়কের মুখেও হাসি ফুটে উঠেছিল। 'সরু ওই বাঁশির মতো গলাটাও ভোলা যায় না।'

প্রায় আধহাত জিব কেটে নিলয় হালদার বলে উঠলেন, 'এমা! আমাকেও চিনে ফেলেছেন আপনারা!'

মুখের হাসি মিলিয়ে যাওয়ার পরে গম্ভীর হলেন সত্যসুন্দর। তারপর কাজুবাদামের দু-তিনটে দানা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, "এই মিথ্যে গল্পটাকেই সত্য বানিয়ে 'সদা সর্বদা সত্যকাহিনী'র প্রথম প্রচ্ছদকাহিনী লেখা হবে। সত্যকাহিনীটা বানানো হবে এই ধাঁচে—। একজন পারভার্ট মাফিয়া ডন সত্যকাহিনীর একজন লেখককে কিডন্যাপ করে নিয়ে চোরাকুঠুরিতে ঢুকিয়ে অর্ডারি সত্যকাহিনী লিখিয়ে নিজে প্রাকটিস করছে সেগুলো। কিন্তু এভাবে চোরাকুঠুরিতে বন্দি থেকে সত্যকাহিনী দিনের পর দিন লিখে যাওয়া খুব কঠিন কাজ। লেখক একদিন পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হয়নি। ডনের লোকজনের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। ভয়ংকর ওই পারভার্ট তখন লেখককে বলেছিল— এবার এমন একটা ব্যবস্থা নেব যাতে তোমার পালাবার ইচ্ছে আর কখনও জাগতে পারবে না। তারপর ঘটল অমানুষিক সেই কাণ্ডটা। মাফিয়া ডনের নির্দেশে ওর লোকজনেরা লেখকের হাঁটু থেকে কেটে পা-দুটো বাদ দিয়ে দিল।"

একটু যেন আঁতকে উঠে মোহন মজুমদার বললেন, 'এতটা করলে লোকে আবার বিশ্বাস করবে তো?'

সত্যকাহিনীর দাগি লেখক বিনায়ক পাল তাল ঠুকে বলার ভঙ্গিতে বললেন, 'লোকে বিশ্বাস করবে কি করবে না— সে দায়িত্ব আমার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'
